গণকবিয়াল রমেশ শীল
ও
তাঁর গান

পুলক চন্দ

বাংলা একাডেমী ॥ ঢাকা

প্রথম প্রকাশ

অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮

ডিসেম্বর, ১৯৭১

প্রকাশক ঃ

ফজলে রাব্বি

পরিচালক

প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ

বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২

মুদ্রণে ঃ

বাংলা একাডেমীর মুদ্রণ শাখা

গ্রন্থ প্রসঙ্গে

এ বাংলায় বসে রমেশ শীলের মতন লোককবির গান বেশী সংখ্যায় পাওয়া অসম্ভব। তবুও আমরা আমাদের সাধ্যমতন পাঠকদের তাঁর গানের সঙ্গে পরিচিত করে তুলতে চেষ্টা করেছি। তবে গানগুলির পাঠ অথবা তাদের কালানুক্রমিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে কোন রকম অভ্রান্তির দাবী নেই। কারণ কবির জীবিতকালেই তাঁর বহু গানের একাধিক পাঠের সন্ধান পাওয়া গেছে। আর যে কোন লোক-কবির ক্ষেত্রে যেমন রমেশ শীলের সমস্ত গানের রচনাকাল সম্পর্কেও তেমনি সঠিক কোন সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব নয়। এছাড়াও চট্টগ্রামের কথ্যভাষায় রচিত গানগুলির ক্ষেত্রে আমরা প্রাপ্ত পাঠের প্রতিই বিশ্বস্ত থাকতে সচেষ্ট থেকেছি।

যাঁদের সহায়তা ছাড়া এই বই হয়ত সহজে প্রস্তুত হতে পারত না তাঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় শ্রীহেমাঙ্গ বিশ্বাসের নাম। শ্রী বিশ্বাস তাঁর সংগ্রহ থেকে রমেশ শীল সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য অকৃপণভাবে হাতে তুলে দিয়ে অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

অধ্যাপক সুনীল চক্রবর্তী রমেশ শীলের দুষ্প্রাপ্য কয়েকটি চিঠি ও ফটো আমাদের ব্যবহার করতে দিয়ে বাধিত করেছেন।

'প্রস্তুতিপর্ব' পত্রিকার সহকর্মী সম্পাদক বন্ধুদের সহযোগিতা অপরিহার্য ছিল।

বই-এর প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন বন্ধুবর শ্রীকল্যাণ মাইতি।

পুলক চন্দ

বিষয়সূচী



রমেশ শীল

"ভারতবাসী যখন ইওরোপে" বইটি হতে   হর দা, মিত্র শ্রীবলিআছে
আমিও পাঠাব একটু দেরী হলে এই চিঠি খান লিখছি আমার
অনেক দুঃখ সমাচার বিষয় আছে তার কতক গোপালবাবুর হাতে
দিলে এই জন্য খাতায় তুলতে দেরী হবে আমার মার নাম রাজ-
কুমারি বাবার নাম চণ্ডীচরণ শীল পো: গ্রাম গোমতী চন্দ্রগ্রাম.
আমার জীবন কবিতায়, সাত বৎসর বয়সে, পিতামার সম্মুখে, ইস্কুলে
পাঠশাল মোরে, একাদশ বৎসর পূর্ণ হইতে, বাবা গেল স্বর্গ
পুরে ॥ আমিও বালক, চালক পা   মামার আর কেহ নাই,
মায়ের অলংকার, সম্বল আমার; বিক্রি করিয়া খাই। তিনভাই
মোরা, মাতা মাতামহি, চৌধুরী এক পরিবার। এই হল লিখন

রমেশ শীলের হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি

কবিগান ও গণকবিয়াল রমেশ শীল

এক ঃ কবিগান

রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকীর বছরের গল্প শুনেছিলাম। কোন নিতান্তই অজ পাড়াগাঁয়ে শতবার্ষিকীর উদ্যোক্তাদের বিপন্ন করে এক কৌতূহলী মানুষ নাকি প্রশ্ন করেছিলেন, 'বাপু এই যে কবি কবি বলছ, এই কবি রবি ঠাকুরটি কে? কই আমাদের গাঁয়ের দিকে তো কোনদিন গান গাইতে আসেনি।' অবাক হবার কিছু নেই এই গল্পে, কারণ এমন কি আজকের দিনেও গ্রামের মানুষের এক বিশাল অংশের কাছে কবি মানেই কবিয়াল। মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির নায়ক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কবিয়াল রমেশ শীল, গোমানী দেওয়ানদের পার্থক্য খুবই মৌলিক, একেবারে শ্রেণী-অবস্থানের। গ্রামীণ সংস্কৃতির কবি তাই অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত কবিয়ালেরাই। বলাই বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দ নন। রেডিও, মাইক ও ফিল্মী সঙ্গীতের আগ্রাসী জগঝম্পের মধ্যে যত বিপর্যস্তই হোক না কেন, গ্রামাঞ্চলে এখনও কবিগানের ধারা বয়ে চলেছে আগের মতন। কবিগায়কদের ঘিরে এখনও উৎসুক শ্রোতাদের সমাবেশ হয়। এখনও ঢোল কাঁসর বাজিয়ে দুই পক্ষের কবির দলের মধ্যে, পৌরাণিক বা সাম্প্রতিক কোন ঘটনা নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে বেধে যায় যুদ্ধ। বুদ্ধির যুদ্ধ, ভাষার যুদ্ধ, জ্ঞানের যুদ্ধ। এখনও কবিওয়ালাদের সঙ্গে গ্রামীণ মানুষের ভাবনার আদানপ্রদান চলে অবাধ, স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এখনও লড়াই-এর নেশায় রাত শেষ হয়ে ভোরের আলো ফুটে ওঠে। তেমন তেমন ক্ষেত্রে এখনও শ্রোতারাই মিলিয়ে দেন দুই বিবাদী পক্ষকে, জোটক দিয়ে দেন তাঁদের মধ্যে। প্রবল উল্লাসের মধ্যে শোনা যায় বিজয়ী দলের নাম, গলায় হয়ত বা গাঁদা ফুলের মালা নিয়ে গুণমুগ্ধ শ্রোতাদের ভিড় ঠেলে তাঁদের পথ করে নিতে হয় নিজের নিজের গ্রামের দিকে।

এই চিত্র শহুরে মধ্যবিত্তদের কাছে আজকে নিতান্তই অপরিচিত। কবিগান এখন নিছক গবেষণার উপাদান, অন্যান্য পাঁচদশটি কিউরিওর মতন অতীতচর্চার

বিষয়। কিন্তু একটা সময় ছিল যখন কলকাতার কালচারে কবিওয়ালাদেরও ছিল নির্দিষ্ট আসন। মধ্য-উনিশ শতক তো বটেই, ১৮৮২ সন পর্যন্ত কলকাতায় পাড়ায় পাড়ায় বিত্তবানদের বাড়িতে বাড়িতে ছিল আখড়াই, হাফ আখড়াই, সখের কবিগানের আসর। ভবানীপুরের কবিদলের সঙ্গে কালীঘাটের, কিংবা বাগবাজারের দলের সঙ্গে জোড়াসাঁকোর দলের লড়াই—এসব তো ছিল প্রায় নিত্যকার সাংস্কৃতিক আনন্দ অনুষ্ঠানের অঙ্গ। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যিনি প্রচুর পরিশ্রমে প্রায়-বিস্মৃত কবিওয়ালাদের গান ও জীবনী তাঁর যুগের মানুষের কাছে উপস্থিত ক'রে কবিওয়ালাদের সম্পর্কে প্রথম আলোচনার সূত্রপাত করেন, তিনি স্বয়ংই ছিলেন কবির দলের একজন বিশিষ্ট বাঁধনদার। তাঁরই শিষ্য হলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। কিশোর রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রভাব-স্বরূপ এই কবিও নিজের কৈশোরে ছাতুবাবু লাটুবাবুর দলের মাইনে করা কবিয়াল হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। হিন্দুমেলার স্রষ্টাদের একজন, স্বাদেশিকতার প্রথম উদ্যোক্তাদের অন্যতম মনোমোহন বসুও ছিলেন কবির দলের সঙ্গে যুক্ত, গান বাঁধতেন তিনি। সর্বোপরি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঙালী মধ্যশ্রেণীর প্রথম আলোকপ্রাপ্ত ও শিক্ষিত-শ্রেষ্ঠদের একজন হয়েও যিনি কবিগানের প্রতি ছিলেন সশ্রদ্ধচিত্ত। কিন্তু স্বাধীন, অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষা-নির্ভর, মধ্যবিত্তের নব্য সংস্কৃতি যত গড়ে উঠতে লাগল ততই কবিয়ালেরা শিক্ষিতজনের অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের শিকার হতে লাগলেন। অবশেষে মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির স্বর্ণযুগে কবিগান অমার্জিত, অশিক্ষিতজনের কুরুচিপূর্ণ সৃষ্টি আখ্যা লাভ ক'রে নিক্ষিপ্ত হল আবর্জনার স্তূপে। এই হাওয়া বদলের বিশেষ তাৎপর্যটুকু বুঝতে গেলে আমাদের কবিগানের ইতিহাসকে একটু ধারাবাহিকতার মধ্যে দেখতে হবে।

কবিগান : সূচনা

কবিগানের আদি রূপ ঠিক কি এবং কতকাল আগে তার উদ্ভব, এসব বিষয়ে নিশ্চিত করে বলা বেশ কঠিন। তবে গবেষকেরা মোটামুটি কয়েকটি বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছতে পেরেছেন বলে মনে হয়। প্রথমতঃ, কবিগান কলকাতা শহরের উঠতি ধনীদের মনোরঞ্জনের জন্য এখানে, এই শহুরে পরিবেশেই জন্মলাভ করেছিল বলে রবীন্দ্রনাথের যে ধারণা, তা আজ আর কেউ-ই প্রায় সমর্থন করেন না। সকলেই কবিগানের লৌকিক উৎসটুকু স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে পাঁচালী

না যাত্রা, না ঝুমুর গান কোনটা থেকে কবিগানের আত্মপ্রকাশ তা নিয়ে এখনও আলোচনা চলছে, যদিও ঝুমুর গানের দিকেই পাল্লা ক্রমশঃ ভারী হয়ে উঠছে। ঝুমুরের বয়স প্রায় হাজার বছরের কাছাকাছি হবে। ঝুমুরের প্রধান বৈশিষ্ট্য : দুই দলের মধ্যে সেখানে পর্যায়ক্রমে গানে গানে উত্তর প্রত্যুত্তর চলে, যার নাম পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ অর্থাৎ চাপান ও উতোর। 'কবিগানে ঝুমুরের এই ধারাই অনুসৃত হয়েছিল' বলে অনেকে মনে করেন। তাঁদের মতে 'কবিগান ঝুমুরেরই গোষ্ঠীভুক্ত।'[১] পাঁচালী, যাত্রা বা ঝুমুর যার থেকেই হোক না কেন, কবিগান গ্রামীণ মানুষের সৃষ্টি। লোকায়ত গ্রামীণ সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারাতেই তার উদ্ভব, বিকাশ ও বিস্তার।

দ্বিতীয়তঃ, অন্তত সপ্তদশ শতাব্দীতেও যে কবিগানের চর্চা জনজীবনে ছিল সে বিষয়ে গবেষকেরা মোটের উপর একমত, যদিও মাত্র অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে কবিগানের সুস্পষ্ট নিদর্শন মেলে, বা প্রাচীনতম কবিয়াল হিসাবে পাওয়া যায় গোজলা গুঁই-এর নাম। সপ্তদশ এবং প্রধানতঃ অষ্টাদশ শতকের ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব কবিগানের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুকে গড়ে তুলেছিল। মুকুন্দরামের দৈব-নির্ভরতার যুগের পর নবাবী আমলের শেষার্ধে কৃষ্ণনগর, চন্দননগর, মুর্শিদাবাদ ও কলকাতার নাগরিক সমাজ হয়ে উঠেছিল ভারতচন্দ্রের রাজানুগৃহীত কাব্যসৃষ্টির পরিমণ্ডল। তারপর ১৭৬০-এ ভারতচন্দ্রের যুগ শেষ হল। একদিকে ভারতচন্দ্র এবং অন্যদিকে ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবপুষ্ট আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উনিশ-শতকী আবির্ভাবের মাঝামাঝি সময়েই কবিগানের একচ্ছত্র রাজত্বকাল।[২] তবে মনে রাখতে হবে গ্রামীণ মানুষের সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও কবিগান শ্রমজীবী মানুষের সমষ্টিগত শ্রমগীতি (*labour song*) নয়। এবং সেই কারণেই, মানুষের শ্রমজীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একাত্ম বা তার শ্রমপ্রক্রিয়ার (*labour process*) সরাসরি ফসল নয় বলেই, কবিগান প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই পরমুখা-

১। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি, পৃ : ১১৭

২। '*...After the Nuddea poets, we come to the day of the kavis, jatras and love-songs, the only species of literary composition to which the nation confined itself for generations.'*

A Popular Literature for Bengal, Bankim Chandra Chattopadhyaya, 'Bankim Rachanavali', Sahitya Samsad, 1969.

পেক্ষী। প্রথম যে কবিয়ালের গান আমরা পাই, সেই গোজলা গুঁইও পেশাদারী দল তৈরী করে 'ধনীদের গৃহে গাওনা করিতেন' বলে জানা যায়। এমন অনুমান করলে হয়ত বিশেষ ভুল হবে না যে একদিকে জীবনধারণের জন্য সামন্ত প্রভুদের, অন্যদিকে প্রেরণার জন্য সমশ্রেণীভুক্ত দরিদ্র শ্রোতাসাধারণের—এই দুই পরস্পর-বিরোধী পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভরশীলতা কবিগানের বিষয়ের, রুচির, এমন কি পরবর্তীকালে তার অস্তিত্বেরও সংকট সৃষ্টি করেছে।

কবিগান ঃ উনিশ শতক ঃ নগরায়ণ

কবিগানের ইতিহাসে এরপর এক তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত উপস্থিত হল মধ্য-অষ্টাদশ শতকে। ভারতবর্ষের পরবর্তী প্রায় দুশো বছরের ভাগ্য পলাশীর যুদ্ধে নির্ধারিত হয়ে গেল। ইংলণ্ডের শিল্প পুঁজির (*Industrial Capital*) বিকাশের তাগিদেই আত্মনির্ভরশীল প্রাচীন গ্রামসমাজ ভেঙ্গে, তার স্বাধীন শিল্পের বিকাশ স্তব্ধ করে দিয়ে ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের স্থায়ী বাজারে রূপান্তরিত করা হল। কোন পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রধানতঃ নয়, কোম্পানী নতুন চরিত্রের সুদৃঢ় এক সামন্ততন্ত্রের পত্তন করল। ১৭৯৩-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে অনুপস্থিত জমিদার ও অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি হল। 'অধিক ধনী হওনের' প্রত্যাশায় তারা 'কলিকাতা কমলালয়ে' এসে ভিড় জমাল। ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল কলকাতার ঐশ্বর্য। নাগরিক সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধির পাশাপাশি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-জাত মধ্য-স্বত্বভোগীদের নির্মম অত্যাচারে কৃষকসমাজের অবস্থা হল শোচনীয়। বিধ্বস্ত গ্রামসমাজ শহুরে ধনিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নবজাগরণ-যজ্ঞের ইন্ধনে পর্যবসিত হল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পৃষ্ঠপোষকতা-নির্ভর গ্রামের কবিগায়কদের একাংশও জীবন ধারণের তাগিদে ছিন্নমূল হয়ে তাদের পৃষ্ঠপোষক অনুপস্থিত জমিদারবর্গের পিছনে পিছনে তাদেরই মনোরঞ্জনের জন্য যাত্রা করল কলকাতার দিকে।[১]

যদিও গ্রামাঞ্চলে কবিগানের একটা স্রোত সব সময়ই বহমান থেকেছে, তবু কবিয়ালদের অনেকেই এসে জড়ো হয়েছিলেন কলকাতা ও তার আশেপাশে।

১। ১৯৪৫ সনে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ববঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে লোকসাহিত্য শাখার সভাপতির অভিভাষণে রমেশ শীল বলেছিলেন, '...আমাদের লোকসাহিত্য ধ্বংস হইবার প্রধান কারণ হইতেছে বৈদেশিক পরাধীনতা। বৈদেশিক শক্তি কর্তৃক আমাদের দেশ দিনের পর দিন লুণ্ঠিত হইল। এই লুণ্ঠনের আতিশয্যে আমাদের গ্রাম্যসমাজ বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত হইয়া

যেমন ফরাসডাঙ্গা থেকে এসেছিলেন রাসু ও নৃসিংহ, ফরাসডাঙ্গার কাছে গরিটি থেকে এসেছিলেন বিখ্যাত এ্যাণ্টনি ফিরিঙ্গি, গুপ্তিপাড়া থেকে এসেছিলেন ভোলানাথ মোদক বা ভোলা ময়রা, অম্বিকা কালনার কাছে সাতগেছে গ্রাম থেকে ভবানী বেনে এসেছিলেন। এছাড়াও চন্দননগর থেকে নিতাই বৈরাগী, শালখে থেকে রাম বসু, বারাসত থেকে বংশী ধর, ধরণী ধর, হুগলী জেলার পিয়াসপাড়া থেকে বলাই বৈষ্ণব—এরকম আরো কতজনই না এসেছিলেন। বিখ্যাত হরু ঠাকুরকে অবশ্য আসতে হয়নি বাইরে থেকে, কারণ তাঁর জন্ম হয়েছিল কলকাতার সিমুলিয়ায়, ১৭৩৯-এ।

জমিদার নবকৃষ্ণ দেবের বাড়িতে ছিল হরু ঠাকুরের কবির দল। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বাড়িতে গোপীমোহন ঠাকুরের বৃত্তিভোগী ছিলেন কবিয়াল লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস। ১৮২০-তে লক্ষ্মীকান্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বৈদ্যনাথ এবং বৈদ্যনাথের পর দৌহিত্র দর্পনারায়ণও বৃত্তিভোগ করেছেন এবং দল পরিচালনা করেছেন। বিখ্যাত ধনী ছাতুবাবু ও লাটুবাবু, পাইকপাড়া ও কাশিমবাজারের ভূস্বামীদেরও ছিল বৃত্তিভোগী কবির দল। এছাড়াও শোভাবাজারের রাজবাড়ি, বাগবাজারের বসুরা, হাটখোলার দত্তরা, কলুটোলার শীলেরা, দর্জিপাড়ার মিত্রেরা তাঁদের বিভিন্ন দোল-রাস-দুর্গোৎসবে কবিগানের ব্যবস্থা করে তৎকালীন কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এইভাবে মুৎসুদ্দি বেনিয়া-শাসিত কলকাতায় মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি গড়ে ওঠার যুগেও কবিয়ালেরা তাঁদের পৃষ্ঠপোষকদের সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির অন্তর্গত এক অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে টিকে থেকেছেন দীর্ঘকাল। তবে নগরায়ণের ধারায় ক্রমশঃ কবিগানের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুগত পরিবর্তন এলো। কবিগানের নতুন রূপ হাফ আখড়াই তৈরী হল সম্পূর্ণ কলকাতাতেই। পাড়ায় পাড়ায় সখের কবির দল গড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে এল একধরণের গ্রাম্য-নাগরিকতা বা বিকৃতি।

পড়িল। দুর্ভিক্ষ মহামারীতে লক্ষ লক্ষ চাষী ধ্বংস হইল। খাজনার দায়ে জমিদার মহাজনের উৎপীড়নে লক্ষ লক্ষ চাষী জমিহারা হইয়া উৎসন্ন গেল। গ্রাম্যসমাজ হিংসা, দ্বেষ, অজ্ঞতা কুসংস্কারের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত থাকিল। দেশ জুড়িয়া অসহায়তা ও ব্যর্থতার গ্লানি পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এ অবস্থায় গ্রাম্য মানুষের সৃষ্ট লোকসাহিত্য যে উৎসন্ন ও ধ্বংসের পথে যাইবে তাহা সহজেই স্বীকার্য।'

'কবিগান ও কবিয়াল রমেশ শীল' প্রবন্ধ থেকে (সুনীল চক্রবর্তী, গণনাট্য, শ্রাবণ ১৩৭৪) উদ্ধৃত।

অথচ সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রধান উত্তরাধিকার যে ধর্মকেন্দ্রিকতা, তা মূলতঃ অটুট থেকে গেল। কারণ বাংলার মধ্যবিত্তের বহুবিজ্ঞাপিত নবজাগরণ ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নতুন সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোরই উপর প্রতিষ্ঠিত। তারই জন্য, কৃষকের দুঃখে কাতর অথচ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলুপ্ত হবার সামান্যতম সম্ভাবনায় শিহরিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গসমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি। ...যেদিন ইংরেজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সেইদিন সে পরামর্শ দিব।'[১] যাই হোক স্বাভাবিক নিয়মেই জন্ম হয়েছিল অসংখ্য স্ববিরোধিতার। আজও আমরা তার থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে না পারলেও মধ্য-উনিশ শতক পর্যন্ত এটা প্রকট ছিল তীব্রতরভাবে। সেই স্ববিরোধিতাপূর্ণ যুগের বিচিত্র ছবি স্পষ্ট ফুটে ওঠে মোহিতলাল মজুমদারের একটি ছোট্ট মন্তব্যে: 'একদিকে চাকুরি-গৌরব, আর একদিকে মিল, বেন্থাম, স্পেন্সার; একদিকে দাশুরায়ের পাঁচালী, আর একদিকে শেক্সপীয়র, মিল্টন, বায়রণ; একদিকে মাহেশের রথ, বাগানবাড়ি, অপরদিকে ব্রাহ্ম মন্দিরে উপাসনা—সে যেন এক অপূর্ব প্রহসন।'[২]

কলকাতার বাবুদের আসরে সুরা আর সাকীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কবিগানে অশ্লীলতার মাত্রা চড়ে গেল বেশ অনেকটা। স্বভাবতঃই জোর পড়ল তার খেউড় লহরের অংশের উপর। যে কোন রকম উত্তেজনা—বুলবুলির লড়াই, পায়রা-বানর-বিড়ালের বিয়ে কিংবা কুকুরের শ্রাদ্ধের পিছনে রাশি রাশি টাকা ওড়াতে অভ্যস্ত উঠতি ধনী-জমিদার-মহাজন-বেনিয়া-মুৎসুদ্দির দল ছিলেন কবিগানে উত্তেজনা বৃদ্ধির পক্ষপাতী। তাই, মূলতঃ তাঁদের মনোরঞ্জনের জন্যই, বুলবুলি বা মুরগীর লড়াই-এর মতন কবিগানও কবির লড়াই-এ রূপান্তরিত হয়ে গেল। প্রাক্‌প্রস্তুতিবিহীন কবিতা রচনার ব্যাপারটা প্রাচীন কবিগানে ছিল না। কবিগান তখন সাধারণতঃ 'দাঁড়া কবি' নামে পরিচিত ছিল। 'দাঁড়া' কথাটির অর্থ 'বাঁধাধরা'। এখন কবিগান হয়ে পড়ল নিছক উপস্থিত বুদ্ধি, শ-কার ব-কার শব্দ ও অনুপ্রাসের লড়াই। তাতে উত্তেজনা ও তাৎক্ষণিক কিছু মজা হয়ত ছিল, কিন্তু সেটুকুর জন্য

১। বঙ্গদেশের কৃষক—বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, প্রবন্ধ খণ্ড, প্রথম অংশ; সাক্ষরতা প্রকাশন।

২। বাংলার নবযুগ—পৃঃ ১৩২

কবিয়ালদের ক্রমশঃই বিসর্জন দিতে হয়েছিল তাঁদের চিন্তার গভীরতা ও আবেগের পরিচ্ছন্নতাকে। বলা চলে, চটুল ও আপাতমনোগ্রাহী ঝুটো ছন্দের কাছে তাঁরা তাঁদের কবিতাকেই দিয়েছিলেন বিকিয়ে।

সমাজ চেতনা?

যে কোন শিল্প বা সাহিত্যকর্মের মতন কবিগানও বিশেষ সমাজ ও শ্রেণীর সৃষ্টি। তাই কবিওয়ালাদের গানের মধ্যে তৎকালীন সমাজকে কোন না কোনভাবে পাওয়ার প্রত্যাশাটি অন্যায় নয়। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যে যদি কেউ এই অষ্টাদশ শতকের কবিগানের কোন সংকলন নিয়ে অনুসন্ধান করতে বসেন তাহলে নিশ্চিতভাবে তিনি বিভ্রান্ত বোধ করবেন। অষ্টাদশ শতকের কবিওয়ালাদের প্রসঙ্গে প্রবীণ গবেষক হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, '…সেদিনের যাহারা কবি তাহারা দুঃখের দিনের—দুর্দিনেরই কবি। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, সে দুঃখের ছায়াও কাহারও কবিতাকে স্পর্শ করে নাই।…অবসাদপঙ্কে আকণ্ঠমগ্ন জাতি—হৃদয় অনুভূতিহীন, দেহ স্পর্শবোধশূন্য, অন্ধ তন্দ্রাহতের মত পড়িয়া রহিল। কেহ হাহাকার করিল না, কেহ এক বিন্দু চোখের জল ফেলিল না, সকল দুঃখ সকল অপমান এমনভাবে মাথা পাতিয়া সহ্য করিল, যেন ইহাই তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য ছিল। সুতরাং কবিওয়ালাগণকে বিশেষ দোষ দেওয়া চলে না।' বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতকের প্রথম পর্বের গোজলা গুঁই, দ্বিতীয়ার্ধের রাসু-নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, বলহরি রায়, নিত্যানন্দ বৈরাগী কিংবা উনিশ শতকের রাম বসু, নীলমণি, নীলু ঠাকুর—কারো গানে সমাজ জীবনের স্পষ্ট-অস্পষ্ট কোন প্রতিচ্ছবি আবিষ্কার করাই প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ভবানী-বিষয়, সখী-সংবাদ, মান, বিরহ, কলঙ্ক, মাথুর ইত্যাদি কতকগুলি নির্দিষ্ট ধর্মীয় ও পৌরাণিক বিষয় ও অধ্যায় নিয়ে কবিগান রচনা করার রেওয়াজও বোধহয় তার একটি কারণ। বহু পুরানো ঐতিহ্যের অনুসরণ করতে গিয়ে বাঁধাধরা বিষয়ের কাঠামোর মধ্যে কবিগায়কেরা নিজের নিজের যুগকে সরাসরি প্রতিফলিত করবার সুযোগ পেতেন কদাচিৎ-ই। এই ঐতিহ্যের বন্ধন যে কতদূর অলঙ্ঘনীয় ছিল, একজন সখের কবির উদাহরণই সে বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করতে পারবে। মনোমোহন বসুর উল্লেখ আমরা পূর্বেই করেছি। সেই যুগের বিশিষ্ট সমাজ-সচেতন পত্রিকা 'মধ্যস্থ'-র সম্পাদক ছিলেন তিনি। হিন্দু মেলায় দেওয়া তাঁর উদ্দীপক বক্তৃতাবলী ছিল সেকালে

চাঞ্চল্যসৃষ্টিকারী।[১] তাঁর অজস্র গানেও আছে সমাজ ও ইতিহাস সচেতনতার সুস্পষ্ট প্রকাশ। 'হরিশ্চন্দ্রের' মতন একটি পৌরাণিক নাটকেও তিনি ট্যাক্স বা কর সংক্রান্ত গানের ভিতরে তখনকার করভার-পীড়িত সমাজের ছবি এঁকেছিলেন।

…দে কর দে কর রব নিরন্তর করের দায় অঙ্গ জর জর !
…আয় কর শুনে, গায়ে আসে জ্বর
…লবণটুকু খাব, তাতেও লাগে কর…
মাদকতা কর ছলে দেশময়
মদ্যের বিপণি, নিত্য বৃদ্ধি হয়
সে গরলে দগ্ধ ভারত নিশ্চয়
হাহাকার রব নিরন্তর।

ঐ একই নাটকে আর একটি গানে আছে পরাধীনতার গ্লানি :

…দিনের দিন সবে দীন হয়ে পরাধীন
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা জ্বরে জীর্ণ, অপমানে তনু ক্ষীণ।
…ছুঁই সূতা পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে
দীয়াশলাই কাটী, তাও আসে পোতে
প্রদীপটি জ্বালিতে ; খেতে, শুতে যেতে
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন।

অথচ ভাবতে অবাক লাগে 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকেও নিজের সময়কে এমনভাবে তুলে ধরতে পারেন যিনি সেই মনোমোহন বসুই কবিগানের নির্দিষ্ট *conventional* বা প্রথাগত ছকের মধ্যে কেমন স্বাতন্ত্র্যহীন, অন্যরকম ! সেখানে খেউড়ের অংশে শ-কার ব-কার শব্দ যুদ্ধেও তাঁর কিছুমাত্র অরুচির প্রমাণ মেলে না। অবশ্য কবি-গানের ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারার কাছে এই অসহায় আত্মসমর্পণ থেকে মনোমোহন বসুর চরিত্রের স্ববিরোধিতার দিক ছাড়াও কবিগানের ঐতিহ্যতন্ত্রের দাপটটুকু স্পষ্ট হয়ে যায় বিশেষ-ভাবে। তাঁর একটি সখী-সংবাদ থেকে কয়েকটি ছত্র এখানে উদ্ধৃত করা চলে :

যোগী বেশে আজ কোথায় চলেছ ?
বল শ্যাম, গুণধাম, মনের রাগে কি বিরাগে, কিবা কার সোহাগে
বিবাগী গৃহত্যাগী হয়েছ ?

১। হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত—যোগেশচন্দ্র বাগল

বিভূতি অঙ্গে মেখেছ !
যেতে যেতে, শ্যাম, কেন শঙ্কা পাও ?
যেন কারে দেখে, দাঁড়াও থেকে থেকে
চন্দ্রাদাসীর দিকে, একবার ফিরে চাও !
কত সুহাসে, সুভাষে, সুরসে, সন্তোষে, বিলাসে দাসীরে কাল তুষেছ।

মোটামুটি এই রকমই ছিল সে যুগের অধিকাংশ কবিগানের চেহারা। এর মধ্যে তৎকালীন সমাজকে খুঁজবার শ্রম পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হবার সম্ভাবনা ষোল আনা।

তবে তৎকালীন ঘটনা নিয়েও কবিগানের যে রেওয়াজ ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় দু'একটা। যেমন 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'তে হুতোম বারোয়ারী তলায় অনুষ্ঠিত এক কবিগানের বর্ণনা দিয়েছেন, যার বিষয় ছিল 'জমিদারী'। সেখানে নতুন পেনাল কোড ও ভিক্টোরিয়ার শাসন কাল সম্পর্কে শোনা যায় কিছু উচ্ছ্বসিত কথা :

পেনেল কোডের আইন গুণে মুকুজ্জের পোর ভাংলো জাঁক
বেআইনির দফারফা বদমাইসি হলো থাক
কুইনের খাসে, দেশে, প্রজার দুঃখ রবে না
মহামহোপাধ্যায় মথুরানাথ মুসড়ে গিয়েছেন
কংস ধ্বংসকারী লেটোর, জেলায় এসেচেন
এখন গুলি গেরেপ্তারি লাঠি দাঙ্গা ফোর্জ চলবে না।

তারপর হুতোমের বর্ণনা : 'জমিদারী' কবি শুনে সহুরেরা খুসি হলেন, দু'চার পাড়াগেঁয়ে রায় চৌধুরী, মুনসী ও রায় বাবুরা মাথা হেঁট কল্লেন, হুজুরী আমমোক্তাররা চোক রাঙ্গিয়ে উঠলো, কবিওয়ালারা ঢোলের তালে নাচতে লাগলো'।[১] আসলে

১। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে কবিয়ালদের একাংশের মধ্যে তখন একপ্রকার পেশাদারী মনোভাবও বর্তমান ছিল। জীবিকার জন্য বাবুদের আনুকূল্যের উপর নির্ভর করে থাকলেও তাদের কেনা দাস তাঁরা ছিলেন না। বাজারের দাবী অর্থাৎ বাবুদের রুচি অনুসারে তাঁরা গান গাইলেও একেবারে স্বাধীন-চেতনাশূন্য ছিলেন না। মেদিনীপুরের জাড়াগ্রামের জমিদার বাড়িতে অনুষ্ঠিত এক কবিগানের আসরে জমিদারের আশ্রিত কবি ঐ গ্রামকে গোলোক বৃন্দাবন বলে বর্ণনা করলে প্রতিপক্ষের (ভোলা ময়রা) কাছ থেকে তীব্র আক্রমণ এসেছিল :

কেমন করে বললি জগা
জাড়া গোলোক বৃন্দাবন !
ওরে বেটা কবি গাবি, পয়সা লবি,
খোশামদি কি কারণ ?

বাবুদের পোষকতা-নির্ভর হয়ে থাকার জন্য এই ধারাটি বিশেষ মাথা তুলতে পারেনি উনিশ শতকে। আর যদিও বা কিছুটা পেরে থাকে কথনো, সময়ের স্রোতে তার সমস্ত চিহ্নই প্রায় মুছে গেছে।[১]

প্রত্যক্ষ প্রতিচ্ছবি না হলেও কবিগানে একই পৌরাণিক কাহিনীর বর্ণনায় দৃষ্টিভঙ্গীগত পরিবর্তন এবং ধর্মীয় বিষয়ের মধ্যে মানব মনের, বিশেষতঃ সাধারণ মানুষের, সহজ স্বতঃস্ফূর্ত লৌকিক আবেগ সঞ্চারের ঘটনাও সময়ের পরিবর্তনের কিছু ইঙ্গিত বহন করে আনে। রামপ্রসাদের শ্যামা সঙ্গীতেও তো তাঁর সমাজের ক্রমঘনীভূত সংকট, ব্যক্তির হতাশা ও অনিবার্য ঈশ্বরমুখীনতার ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। ধর্মীয় বিষয় অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ বা হরগৌরীকে কেন্দ্র করে কবিগানে এক সময়কার যে বহু-কথিত অশ্লীলতা বা কুরুচির প্রাদুর্ভাব, তার মধ্যেও পাওয়া যাবে একটি আবদ্ধ গতিহীন সমাজ ও বিকৃত জটিল সমাজ-মানসের নির্ভুল ছাপ। যেমন রাধা-কৃষ্ণকে নিয়ে রূপচাঁদ পক্ষীর একটি গানে উনিশ-শতকী অবক্ষয়-কবলিত বাবু-সংস্কৃতির সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় :

আমারে ফ্রড করে কালিয়া ড্যাম! তুই কোথায় গেলি।
আই য়্যাম ফর ইউ ভেরি সরি, গোলডেন বডি হল কালি,
হো মাই ডিয়ার ডিয়ারেস্ট, মধুপুর তুই গেলি কৃষ্ণ!
ও মাই ডিয়ার। হাউ টু রেস্ট, হিয়র ডিয়ার বনমালি ॥
পুওর ক্রিচর মিল্ক-গেরল, তাদের ব্রেস্টে মারলি শেল,
ননসেন্স তোর নাইকো আক্কেল, ব্রিচ অব কনট্রাক্ট করলি ॥

বস্তুত, প্রাচীন কবিগানের মধ্যে তৎকালীন সমাজকে খুঁজে পেতে গেলে তা পেতে হবে প্রধানতঃ এইভাবেই। দুঃখজনক হলেও মেনে নিতে হয়, কবিগান প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই সামন্তশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা-নির্ভর। এবং সেই কারণেই, সাধারণ মানুষের সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও, দৈনন্দিন লোকায়ত জীবনের সুখদুঃখের প্রতি, সমাজবাস্তবতার প্রতি কবিগানের এই ব্যাপক অমনোযোগিতা।

১। স্মরণে রাখা প্রয়োজন, আমাদের হস্তগত কবিগানের সামান্য ভগ্নাংশ থেকে তার সম্পূর্ণ রূপ কল্পনা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। কবিগানের শতকরা নব্বই ভাগেরই জন্ম আসরে, মুখে মুখে, প্রাক্‌প্রস্তুতিবিহীনভাবে। তার পূর্ণাঙ্গ রূপও তাই লিখিতভাবে পাওয়া অসম্ভব। যেটুকুও বা মেলে তার অধিকাংশই বাঁধা গান, আগে থেকে তৈরী।

মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ : অবহেলিত কবিগান

এদিকে, যাদের পৃষ্ঠপোষকতার প্রশ্রয়ে একসময়ে কবিগান কলকাতায় আসর জমিয়েছিল তাদেরই পরবর্তী প্রজন্ম একে আর নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের অন্তর্গত বলে স্বীকৃতি দিতে সম্মত হল না। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এলো মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ। ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে সহযোগী *native elite* বা দোভাষী শ্রেণী তৈরীর পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হল। ভূম্যধিকারী নাগরিক মধ্যবিত্তের এক অংশের সঙ্গে সামান্য সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকলেও আধুনিক শিক্ষার পরিখা নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে দেশের প্রধান অংশ কৃষক সমাজ ও তার সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। স্পষ্টতর হয়ে উঠল গ্রামীণ ও নাগরিক সংস্কৃতির বিরোধ। নগর-সংস্কৃতির অস্থির যৌবনের সহচর কবিগান অবশেষে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হল। 'পুরাতনী'র অন্তর্গত হয়ে তার শেষ আকর্ষণটুকু বজায় থাকল। কবিগান ফিরে গেল তার গ্রামীণ উৎসে—গ্রামীণ মানুষের সান্নিধ্যে।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের অর্থাৎ ১৮৬১-র আগে তাঁর নিজের আবির্ভাবটুকু বাদ দিয়ে মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির পক্ষে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির অধিকাংশই ঘটে গেছে : ১৮১৭ তে হিন্দু কলেজ, ১৮৩৫-এ মেকলের মিনিটে ইংরেজী শিক্ষার নীতি, ১৮৪৪-এ ইংরেজী শিক্ষাই চাকুরীর একমাত্র ছাড়পত্র—হার্ডিঞ্জের এই ঘোষণা, ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহ, ইংরেজ শাসনের প্রতি বাঙালী মধ্যশ্রেণীর আনুগত্য প্রকাশ, ভিক্টোরিয়া শাসনের সূচনা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা—ইত্যাদি। 'সেকাল আর একালের সন্ধিস্থলে' যাঁর 'প্রাদুর্ভাবে'র কথা বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, কবিগানের সেই প্রবল সমর্থক ঈশ্বর গুপ্তের পরবর্তী পর্যায়ের কবিগান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অসহিষ্ণু তীব্র আক্রমণ এই সাংস্কৃতিক হাওয়া বদলের দিক-নির্দেশক হিসাবে তাৎপর্যপূর্ণ। আর স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র হলেন ঈশ্বর গুপ্ত ও রবীন্দ্র-নাথের অন্তর্বর্তী উত্তরণপর্বের (*transitional phase*) প্রতিনিধি। রবীন্দ্রনাথ কবিয়ালদের বলেছিলেন 'নষ্টপরমায়ু কবির দল'। বলেছিলেন, 'একদিন হঠাৎ গোধূলির সময়ে যেমন পতঙ্গে আকাশ ছাইয়া যায়, মধ্যাহ্নের আলোকেও তাহা-দিগকে দেখা যায় না এবং অন্ধকার ঘনীভূত হইবার পূর্বেই তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়—এই কবির গানও সেইরূপ একসময় বঙ্গসাহিত্যের স্বল্পক্ষণস্থায়ী গোধূলি

আকাশে দেখা দিয়াছিল…এখনও তাহাদের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।'[১] রবীন্দ্রনাথের ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে শহর কলকাতার কালচারের অন্যমনস্কতার সুযোগে এইখানেই হয়েছিল কবিগানের প্রথম আবির্ভাব। তিনি তার গ্রামীণ উৎসটুকু খেয়াল করেননি। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যু দেখেছিলেন কবিগানের। চোখের সামনে তাকে মুছে যেতে দেখেছিলেন কলকাতার বুকে। কিন্তু গ্রামে গঞ্জে দরিদ্র কবিয়ালদের মরণপণ যুদ্ধ তিনি দেখতে পাননি। আর বলাই বাহুল্য, লক্ষ্য করেননি তিনি নতুন যুগের নতুন চরিত্রের কবিগানের আবির্ভাবের ঐতিহাসিক ঘটনাটি। আলোচনার পরবর্তী অংশে আমরা সেই ঘটনাটিই অনুসরণ করবার চেষ্টা করব।

নবজন্ম

উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বৃটিশের আনুকূল্যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর কাছে একটি-একটি করে সব-পেয়েছির দেশের দরজা খুলে গেলেও একই সঙ্গে তাদের মধ্যে জমে উঠেছিল অসন্তোষ। এ্যালান অক্টাভিয়ান হিউমের পরামর্শে বৃটিশের আঁতুড় ঘরে জন্ম হয়েছিল জাতীয় কংগ্রেসের। বিক্ষুব্ধ মধ্যবিত্তের এক বিশাল অংশ এক সময় অন্য কোন পথ সামনে না পেয়ে কংগ্রেসেই এসে যোগ দিল। আর পদে পদে কোণঠাসা করে ফেলতে লাগল আপসপন্থী নেতৃত্বকে। যাইহোক উনিশ শতকের মধ্যবিত্তের ধূমায়িত বিক্ষোভ বিশ শতকে ফেটে পড়ল। বঙ্গভঙ্গ, সন্ত্রাসবাদ, সত্যাগ্রহ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পথে সাহিত্যে সঙ্গীতে রাজনীতিতে স্বদেশ চেতনার প্রকাশ ঘটতে লাগল। আত্মপ্রকাশ করল ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রসারলাভ করল স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলন। গ্রামাঞ্চলেও গিয়ে পড়ল তার ঢেউ। কবি গায়কদের অনেকেই অসাম্প্রদায়িক দেশাত্মবোধ, সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ বিরোধী চেতনার সংস্পর্শে এলেন। জমিদারতন্ত্রের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্যের যুগ শেষ। তবুও সামন্তশ্রেণীর উপর কবিগানের যে সামান্য নির্ভর-শীলতা তাও শ্রমজীবী মানুষের জীবন সংগ্রামের সংস্পর্শে দ্রুত মুছে যেতে লাগল। ক্রমে পরিবর্তন এলো কবিগানের চরিত্রে। অবশ্য কবিগানের আধুনিক গবেষকেরা

১। লোকসাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কি রহস্যজনক কারণে জানি না, এই পরিবর্তনকে সচরাচর অগ্রাহ্য করে যান। একজন বিশিষ্ট গবেষক এমন কথাও লিখেছেন, 'কবিগান ফিরে গিয়েছে সেই-খানে, যেখান থেকে একদিন সমাজের চিত্তশূন্যতার সুযোগ নিয়ে উঠে এসেছিল। গ্রামাঞ্চলে নিম্নতর লোকসমাজে এখনও কবিগানের চর্চা হয়, কিন্তু বলিষ্ঠতর চিন্তা এবং কল্পনায় যে আসন পূর্ণ, সেখানে আর সে স্থান পায় না।' (ভবতোষ দত্ত, কবিজীবনী. পৃঃ ৪১)

যাই হোক পরিবর্তন একদিনে নয়, এসেছিল ধীরে ধীরে। আধুনিক কবি-গানের গুরু হিসাবে যিনি পরিচিত, যাঁর জন্ম হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের জন্মের বছর ১৮৬১-তে, সেই ঢাকা (নরসিংদি)-র বিখ্যাত কবিয়াল হরিচরণ আচার্যের কবিগানের মধ্যেই প্রথম নতুন যুগের স্পর্শ পাওয়া গেল। রাধা-কৃষ্ণ ইত্যাদি প্রচলিত বিষয় নিয়ে কবিগান রচনা করলেও সমসাময়িক সমাজ ও সমাজবদ্ধ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা সুখদুঃখের প্রতি উদাসীন ছিলেন না তিনি। গতানুগতিক বিষয়, এমনকি লহর খেউড়ের অংশকেও তিনি অশ্লীলতামুক্ত করে তুলেছিলেন সাধ্যমতন। যেমন কৃষ্ণের প্রতি রাধার সখীর পরিহাসমিশ্রিত উক্তি :

বল বল হে ডাইলের ঠাকুর, হৃষিকেশ, সবিশেষ শুনব বিবরণ
···সোনামুগ রাইকিশোরী, কুব্জা তোমার খেসারী,
এখনও সত্য করে কও শ্রীহরি, কোন জায়গায় কোন ডাইলের
কোন আস্বাদন।
পড়ত সোনামুগে মানের সম্ভার, নিত্য তার বাড়ত হে গৌরব,
ছুটত চারিদিকে সৌরভ,
তেজপাতা লঙ্কা মেথি, পায় ধরা কান্না স্তুতি,
পরে মিলনঘৃত দুই-এক রতি ডাইল হৈত দেবতার দুলভ।

কিংবা আন্তরিকতার পরিচ্ছন্ন প্রকাশ আর একটি গানে :

আমার মন বাঁধা রাধা চরণে॥
আমার ধ্যানেতে রাধিকা, জ্ঞানেতে রাধিকা,
রাধিকা জীয়নে মরণে॥ মন বাঁধা···
নিরজনে আমি বসে চুপি চুপি, সম্মোহিনী সুরে মুরলী আলাপি,
সংলাপে বিলাপে রাধা মন্ত্র জপি—
থাকি রাধা নাম স্মরণে॥ মন বাঁধা···

অন্যদিকে, সমাজের শোচনীয় দুরবস্থা, অনাচার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সংকট থেকে সুরু করে হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কারাবরণ ইত্যাদি অনেক কিছুই ছিল হরি আচার্যের গানের বিষয়। তিনি গেয়েছিলেন স্বদেশী ধারার গান :

হিন্দু মুসলমান এক মায়ের সন্তান
একই সূত্রে গাঁথা
ভাইরে এক প্রাণে গাঁথা
উঠিল জয়ধ্বনি মেদিনী প্রকম্পিতা।

হরি আচার্য একা নন, তাঁর পথ ধরে বাঙলাদেশের গ্রামে গঞ্জে জেলায় জেলায় কবিগানের পুরাতন স্রোতের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ছোট বড় অসংখ্য কবিয়ালের শ্রম, সাধনায় তিলে তিলে গড়ে উঠতে লাগল নতুন ধরণের কবিগানের চরিত্র। মূল বিষয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্ম সংক্রান্ত থেকে গেলেও তার আসর বন্দনায় কিংবা মালসি গানে প্রায়শঃই সমসাময়িক সমাজের বিভিন্ন সমস্যা বা ঘটনার ছায়াপাত ঘটতে লাগল। যেমন দুর্ভিক্ষের চিত্র :

অন্ন দে অন্ন দে করে সবে ডাকে অন্নদা তোবে
তুই বিনে অন্নদা মাতা কে আছে আর অন্নদাতা
অন্নদানে কৃপণতা কোন্ মাতা করে।
এবার দুর্ভিক্ষের কাল করাল গ্রাসে
দেশে দেশে উঠল হাহাকার
হল চাউলের মণ সাড়ে তিন টাকা···

কিংবা স্নেহলতার আত্মহত্যার মতন ঐতিহাসিক ঘটনা (১৯১৩) :

সংসারের দুঃখে দুঃখিতা
গরীব পিতা মাতার স্নেহলতা, স্নেহলতা ছিল,
আপন বসনে কেরোসিন ঢেলে,
আগুন জেলে, দুঃখাগুন নিভাইল।
পেয়ে স্নেহলতার বার্তা,
পড়েছে মরণের পর তা
যারা সমাজ সংস্কারের কর্তা, তারা কি আজ অন্ধ হল ?[১]

এতকাল গ্রামীণ সংস্কৃতির এই মাধ্যমটিতে শাসক শ্রেণীর দর্শনেরই ছিল প্রাধান্য। শেষ পর্যন্ত আঘাত এলো তারই উপর। সংঘবদ্ধ হতে লাগলেন কবিওয়ালারা। তাঁরা যুদ্ধ ঘোষণা করলেন সামন্ততান্ত্রিক উত্তরাধিকারের বিরুদ্ধে। লড়াইএর ক্ষেত্রে যেমন, মন্বন্তর বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মুহূর্তেও তেমনি কবিগান তার ইতিহাসে এই প্রথম হয়ে উঠল সাধারণ মানুষের বিশ্বস্ততম বন্ধু। শ্রীহট্টের কবিয়াল প্রসন্ন কুমার চন্দ বাঙলাদেশের দুর্ভিক্ষের বর্ণনা করলেন তাঁর গানে :

ছিল ধন্য পুণ্য জন্মভূমি
মোদের সোনার বাংলা দেশ,
হায়রে দুর্ভিক্ষ অনশনে এ দেশে বর্তমানে,
হোল দুঃখ দুর্গতির একশেষ।

বীরভূমের গোমানী দেওয়ান গাইলেন সংগ্রামের গান :

ভয় কিরে ভাই বঙ্গবাসী থাকতে তোদের এত বল,
দ্বার খুলে চল আগল ভেঙ্গে মোছ রে মায়ের নয়ন জল।...
ক্ষেপলে তোরা বজ্র দাপে কে রুখবে তোদের বল রে বল,
মাখলে মাটি ধরলে লাঠি উঠবে কেঁপে ধরাতল।

চট্টগ্রামের রমেশ শীল গাইলেন :

দেশ জ্বলে যায় দুর্ভিক্ষের আগুনে
এখনো মানুষ জাগিল না কেনে ?

বরিশালের নকুলেশ্বর সরকার :

এবার জাগো ভারতবাসী।
হয়ে সামর্থ্যহীন পরের অধীন
আর কতদিন থাকবে বসি।...
আমরা কর্ম দোষে নিজের দেশে আছি পরবাসী,
সবে রুখে দাঁড়াও ইংরেজ তাড়াও—
ভয় করো না জেল কি ফাঁসী॥

রাইগোপাল দাস গাইলেন :

এরূপ করে দেশের মানুষ কয় দিন বাঁচিবে
থর থর কাঁপে দেহ অন্নের অভাবে.

দুরন্ত দুর্ভিক্ষ এসে রক্ত মাংস নিল শুষে
কোথা যাব পায় না দিশে কে বা রাখিবে।

গোবিন্দচন্দ্র দে গাইলেন :

এবার জেগে উঠ ভারতবাসী হিন্দু মুসলিম ভাই
দুর্ভিক্ষ আসিল দেশে কি হবে উপায়
কেহ বলে এই কি হৈল, কেমন দিন আসিয়া পৈল
দেশকে দেশ উজাড় হৈল সীমা সংখ্যা নাই।

কবিগানের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথম সমাজ ও ইতিহাস-সচেতন একদল কবিয়ালের গানের ভিতরে মিলল সমকালীন সমাজের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। প্রমাণিত হল, একটি বিশেষ যুগের জঠরে জন্ম হলেও নতুন যুগের প্রয়োজনে নতুন পরিবেশে কবিগানের নবজন্ম হওয়াটা অসম্ভব নয়।*

---

* এখানে অধ্যাপক জর্জ টমসন প্রদত্ত একটি সম-চরিত্রের তথ্যের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯৪৬ সনে লেখা তাঁর বিখ্যাত বই Marxism and Poetry-তে অধ্যাপক টমসন সোভিয়েতের কাজাখদের মধ্যে বহুকালের প্রচলিত minstrels' contest-এর উল্লেখ করে বলেছেন, 'They sang extempore. Each of them after listening to a song by another competitor would have to answer him in verse immediately. অধ্যাপক টমসন এই প্রাক্-প্রস্তুতিবিহীন কবিগানের রূপান্তরের কথাও আমাদের জানিয়েছেন, বলেছেন: কাজাখেরা যখন ভবঘুরে ছিল তখন তারা নিজেদের উপজাতি বা tribe এবং উপজাতি-প্রধান বা tribal-chief-দের গৌরবগাথা গাইত, আর এখন 'they sing of weapons forged in Kazakh factories for the war against the fascist invaders.' আমাদের কবিগানের ক্ষেত্রেও এককালে যারা গাইত রাধাকৃষ্ণের গান তাদেরই উত্তরসূরীদের পরবর্তীকালে 'জোতদার-মজুতদার', 'ধনতন্ত্র-সমাজতন্ত্র' নিয়ে গান গাইতে দেখা গেল।

দুই : গণকবিয়াল রমেশ শীল—পটভূমি ও কবিকৃতি

প্রস্তাবনা

প্রচলিত অর্থে কোন বিশেষরকম নাটক ছিল না রমেশ শীলের জীবনে। যেটুকু ও-বা ছিল তা কেউ লিপিবদ্ধ করে রাখেননি ভবিষ্যতের জন্য। সম্ভবতঃ তার কারণ এই যে, ঘটনাস্রোতে ভাসতে অভ্যস্ত শহুরে মানুষের কাছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে মনে হয়ে থাকে উত্থান-পতন-বিহীন, একই স্বরগ্রামে বাঁধা। প্রতি মুহূর্তের যে লড়াই সেখানে রয়েছে তা বাইরের অনভ্যস্ত চোখে নাটকীয়তা নিয়ে ধরা পড়ে না। অথচ কবিয়াল-সংস্কৃতির প্রাচীন পিছুটান কাটিয়ে রমেশ শীলের ধীরে ধীরে শ্রেণী-সচেতন গণ-কবিয়ালে রূপান্তরিত হবার মধ্যে তো কিছু কম নাটক থাকার কথা নয়। মনে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক : কোন্ সামাজিক সংঘাত, ব্যক্তির সঙ্গে ঐতিহ্যের কোন্ দ্বন্দ্ব কিভাবে রূপ পেয়েছিল রমেশ শীলের জীবনে? শ্রেণীশোষণের কোন্ চেহারা নিজের চোখে দেখেছিলেন তিনি, যা তাঁকে ক্রুদ্ধ করেছিল? মানুষের কোন্ সংগ্রামী মূর্তিই বা তিনি দেখেছিলেন যা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল শোষিত মানুষের পাশে নির্ভয়ে অবিচলভাবে দাঁড়াতে? এই আঞ্চলিক ও সমসাময়িক অন্তরঙ্গ ইতিহাসটুকু জানা রমেশ শীলের মতন কবিয়ালদের ক্ষেত্রে একান্তই জরুরী, বা বলা চলে একরকম অপরিহার্য। কারণ, ভাবনাচিন্তায় ব্যাপকতা, দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্বজনীনতা থাকলেও এঁরা কিন্তু ভীষণভাবে আঞ্চলিক। এঁদের শিকড় মূলতঃ খাদ্য সংগ্রহ করে আশপাশের মাটি থেকেই, যদিও বাইরের দুনিয়ার বাতাস লাগে তাঁদের ডালপালায়। সর্বোপরি এঁদের অধিকাংশ বিশ্বাসই স্থানীয় জীবনচর্চা থেকে সরাসরি উঠে আসা, নিছক তত্ত্বভিত্তিক নয়। তাই

শুন সর্বহারা ভাই, এবার মোদের শেষ লড়াই
দুনিয়াময় গণডঙ্কা বেজে উঠেছে

শুনিয়েছেন যে রমেশ শীল তিনিই কিন্তু ভীষণ রকম 'চাডিগাঁইয়া' অর্থাৎ 'চাটগেঁয়ে' ('আমরা চাডিগাঁইয়ারে আমরা চাডিগাঁইয়া')।

সুতরাং রমেশ শীলের বিকাশকে যে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ইতিহাসের ধারার মধ্যেই দেখা উচিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও পাঠকদের কাছে সে রকম একটি সামগ্রিক চিত্র উপস্থিত করতে আমরা অক্ষম। কারণ, যে একটিমাত্র জীবনীগ্রন্থ (কবিয়াল রমেশ শীল—পূর্ণেন্দু দস্তিদার) আমরা পেয়েছি তা কবির জীবিতকালে লেখা হলেও ভীষণ রকম অসম্পূর্ণ। বিশেষ করে আমাদের প্রার্থিত এই প্রেক্ষাপটটিই তাতে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত। এই 'জীবনী' থেকে মূলতঃ যা জানা যায়, তা হল: বিভিন্ন সময়ে, বিদ্রোহে ও দুর্ভিক্ষে, গান লিখেছিলেন এবং গেয়েছিলেন রমেশ শীল, লিখেছিলেন মাঝভাণ্ডারের ধর্মসঙ্গীত, আসরের পর আসর মাতিয়েছিলেন নতুন চরিত্রের কবিগানে, বায়না পেয়েছিলেন একের পর এক, খুশী হয়েছিল শহরের সংস্কৃত মানুষ—ইত্যাদি। যেন সবটাই ছিল স্বাভাবিক। এক-একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তে অমন গান লেখারই যেন কথা ছিল। কিন্তু কি রকমটি ছিল বাইরের প্রভাব, সমাজ ও কবিয়াল-ঐতিহ্যের সঙ্গে সংঘাতই বা কিভাবে দানা বেঁধেছিল কবিজীবনে, তা জানা যায় না সঠিকভাবে। এমন কি পাওয়া যায় না চট্টগ্রামের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামী পটভূমিটুকু, যা বাদ দেওয়ার অর্থ রমেশ শীলকে একরকম ইতিহাসবিচ্যুত ফসল হিসাবেই ধরে নেওয়া। অথচ লেখক পূর্ণেন্দু দস্তিদার মশাই নিজে ছিলেন চট্টগ্রাম গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। তিনিও জানেন: 'বিগত অর্ধশতাব্দীর ইতিহাসে দেশের মধ্যে পরশাসনের বিরুদ্ধে যে কোন মুক্তি সংগ্রাম……সব কিছু এই পল্লীকবিমনকে এসে স্পর্শ করেছে……।' এ থেকে আবার একথাও মনে ওঠা স্বাভাবিক যে এর চাইতে বেশী ঘটনা রমেশ শীলের জীবন সম্পর্কে জানাও হয়ত আর সম্ভব নয়। হয়ত তাই, কিন্তু একজন প্রবীণ গণনাট্য কর্মীর পক্ষে কবিয়াল রমেশ শীলের গণকবিয়ালে রূপান্তরিত হবার মতন ঘটনাটিকে সমাজ-অর্থনীতিগত আঞ্চলিক পটভূমিতে অথবা সংগ্রামী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করাটা কেনই বা সম্ভব হল না, তাও ভাবা প্রয়োজন। তবে আমরা যে তাঁর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ এই কথা মনে রেখেই পূর্ণেন্দু দস্তিদারের রচনা সম্পর্কে এই অভিযোগ উপস্থিত করলাম। না হলে তিনিই তো একমাত্র ব্যক্তি যিনি রমেশ শীলকে বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে উপস্থিত করে নিজের প্রগতিশীল দায়িত্বটুকু অন্ততঃ পালন করেছেন।

কবিয়াল থেকে গণকবিয়াল

রমেশ শীলের জন্ম (১৮৭৭ ; বাংলা ১২৮৪, ২৬শে বৈশাখ)[১] চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী থানার গোমদণ্ডী গ্রামে। তাঁর বাবা চণ্ডীচরণ শীলের জমিজমা ছিল না ছিটেফোঁটা। পেশায় তিনি ছিলেন ক্ষৌরকার[২], তার সঙ্গে গাছ গাছড়ার শিকড় দিয়ে ঘা সারানোর টুকিটাকি ব্যবসাও চালাতেন তিনি।[৩] ছোটবেলা থেকে অসম্ভব দারিদ্র স্বভাবতই রমেশ শীলের জীবনকে জড়িয়ে ধরেছিল পাকে পাকে। তবুও পড়াশোনা করতে হবে। তাই হাতে-খড়ি হয়েছিল নিয়ম মতন। তারপর ভর্তিও হয়ে গিয়েছিলেন এক সময় প্রাইমারী স্কুলে। গানের দিকে তাঁর ভীষণ ঝোঁক একেবারে ছোটবেলা থেকেই ছিল। মাঠে ঘাটে, নিজেদেরই বাড়ির দাওয়ায় শুনতে পেতেন গান। তাঁরই ভাষায়

মাঠের দিকে দিলে কান কত মধুর চাষীর গান
রাত্রে শুনতাম মনসার ভাসান
জারি সারী, বাউল গাজী, এই সকল শুনিনা আজি
নিরানন্দে সবার মুখ ম্লান।······

ছেলের এই বিশেস ঝোঁকটি লক্ষ্য করেছিলেন রমেশের বাবা। তাই তিনি ছেলেকে উৎসাহিত করবার জন্য শহর থেকে কিনে নিয়ে গিয়ে উপহার দিয়েছিলেন 'বৃহৎ তর্জার লড়াই'। বালক রমেশ শীল তাঁর আরো দু'একজন বন্ধুর সঙ্গে সেই সব গান মুখস্থ করতেন। আর সুর করে তা শুনিয়েও দিতেন নিজেদেরই বাড়ির উঠোনে বসা প্রায় প্রতিদিনকার সান্ধ্য গানের আসরে।

কিন্তু এ আর কতদিন! তাঁর যখন মাত্র এগার বছর বয়স তখন হঠাৎই মারা গেলেন চণ্ডীচরণ শীল।[৪] রেখে গেলেন বালক রমেশের কাঁধে মা দিদিমা

১। কবিয়াল রমেশ শীল—পূর্ণেন্দু দস্তিদার। অবশ্য এই জন্মের সন তারিখটিও কতখানি নির্ভুল সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কারণ, স্বয়ং রমেশ শীলই বিভিন্ন তারিখের উল্লেখ করেছেন বিভিন্নজনের কাছে।

২। লোককবি রমেশ শীল—কল্পতরু সেনগুপ্ত (সাপ্তাহিক বসুমতী, ১৯৬৭)। পূর্ণেন্দু দস্তিদার রমেশ শীলের বাবার কোন জীবিকার উল্লেখ করেননি।

৩। চাটগাঁয়ের কবিওয়ালা—সুভাষ মুখোপাধ্যায় (আমার বাংলা)।

৪। পূর্ণেন্দু দস্তিদার রচিত জীবনী গ্রন্থে এই তথ্য রয়েছে। অথচ কল্পতরু সেনগুপ্ত মশাই জানাচ্ছেন 'সাত বছর বয়সে' তিনি পিতৃহারা হন। (গণনাট্য, শ্রাবণ, ১৩৭৮)।

আর তিন বোনের একটা বড়সড় পরিবারের জোয়াল। তাই পড়াশুনায় মোটামুটি ভাল হলেও প্রাইমারী পরীক্ষার আগেই তাঁকে ছেড়ে দিতে হল স্কুলের গণ্ডি। নেমে পড়তে হল জীবিকার সন্ধানে। কিছুকাল পরে নিজেই লিখেছিলেন সে সম্পর্কে

আমিই বালক, চালক, পালক
আমার আর কেহ নাই
মায়ের অলঙ্কার সম্বল আমার
বিক্রী করিয়ে খাই
তিন সহোদরা, মাতা, মাতামহী
ছয় জনে এক পরিবার
এই হইল শিক্ষা আমার,
প্রাইমারী পরীক্ষা ভাগ্যে না জুটিল আর।

এক সময় জীবিকার জন্যই তাঁকে বার্মার পথে পাড়ি দিতে হল। সেখানে এগার বছর কাটিয়ে তিনি ফিরে এলেন দেশে।[১]

এর পর থেকে যেমন একদিকে রমেশ শীল পরিবারকে টিকিয়ে রাখার জন্য রোজগার-পাতির চেষ্টায় লেগে থাকলেন উদয়াস্ত, অন্যদিকে তারই ফাঁকে ফাঁকে চলল গান বাঁধার বিরামহীন সাধনা। কবিগান কোথাও হচ্ছে খবর পেলেই নাওয়া খাওয়া ফেলে ছুটতেন সেখানে। শুনতেন নিবিষ্ট মনে। চোখ ভ'রে দেখতেন চিন্তাহরণ আর মোহনবাঁশির মতন কবিয়ালদের কাণ্ড-কারখানা, আক্রমণ প্রতি-আক্রমণের পালা। লক্ষ্য করতেন, কি অনায়াসে 'শবদে শবদে বিয়া' দিয়ে গানে গানে মনের সমস্ত ভাবই প্রকাশ করতে তাঁরা সক্ষম। দেখতেন হাজার হাজার শ্রোতার বিস্মিত ব্যাকুল চোখের সামনে অতি সাধারণ দরিদ্র কবিয়ালরাই উৎসাহে উদ্দীপনায় হয়ে যেতেন একেবারে অন্য মানুষ। ঝকঝক করত তাঁদের চোখ। তাঁদের অনুপ্রাণিত কণ্ঠ স্বতঃস্ফূর্ত সুর-ছন্দ-শব্দের সম্মিলিত প্রকাশে কি সহজেই না অজস্র মানুষের মনের মধ্যে প্রবেশের অধিকার পেয়ে যেত। একথা সত্যি, শিক্ষার প্রাচীর, কী প্রাচীন কালে মধ্যযুগে বা আজকে, কৃষকসমাজের

১। 'কবিয়াল রমেশ শীল', কল্লোল সেনগুপ্ত। (গণনাট্য, শ্রাবণ ১৩৭৪) 'আঠারো বছর বয়সে তিনি চট্টগ্রামে ফিরে এলেন'।

লোক-কবিদের তার শ্রোতাদের কাছ থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারেনি। শ্রোতৃসমাজও নিরপেক্ষ নয়। বরং সহযোগী, সহায়ক। এই শ্রোতাদের কাছ থেকে প্রেরণালাভ না করলেও তো লোককবির পক্ষে নিজের ভূমিকা পালন সম্ভবপর নয়। কারণ তিনি তো আর ঘরে বসে কাগজ কলমে কবিতা লেখেন না, আবৃত্তি করেন হাজার হাজার শ্রোতার চোখের সামনে। কবিতা তৈরী করেন না, সৃষ্টি করে থাকেন কোনরকম প্রাক্‌প্রস্তুতি ছাড়াই।[১] সন্দেহ নেই কবিগানের এই গণরূপটিই রমেশ শীলকে আকর্ষণ করেছিল সব চাইতে বেশী। তাই এক সময় এল, যখন কবিয়াল হওয়ার বাসনাটিকে রমেশ তাঁর সমস্ত স্বপ্ন দিয়েই সন্তর্পণে লালন করতে থাকলেন।

তারপর একদিন একরকম হঠাৎই আনুষ্ঠানিকভাবে একুশ বছরের রমেশ শীলের কবিয়ালের জীবন স্থরু হয়ে যায়।[২] গিয়েছিলেন তিনি চট্টগ্রাম শহরের সদরঘাট জেলেপাড়ায়, কবিগান শুনতে। গান শোনাবার কথা ছিল বৃদ্ধ কবিয়াল চিন্তাহরণ ও মোহনবাঁশির। গান আরম্ভ হয়ে যায় ভালয় ভালয়। কিন্তু মাঝপথে হঠাৎ বৃদ্ধ চিন্তাহরণের গলা ধরে আসে, তিনি অসহায়ভাবে বসে পড়েন। সভা প্রায় ভেঙ্গে যায় আর কি! এমন সময় রমেশের এক বন্ধু ঘোষণা করে বসলেন, দরকার হলে তাঁরা চট্টগ্রামে যাকে বলে কবি-সরকার অর্থাৎ কবিয়ালকে উপস্থিত করতে পারেন। শ্রোতারা তাতেই রাজী। তাঁরা শুনতে এসেছেন কবিগান। তা নতুন কোন কবি-সরকারের সঙ্গে হলেও আপত্তি নেই। তার উপর বিখ্যাত মোহনবাঁশির কাছে নতুন কবিয়ালের নাজেহাল হওয়াটাও তো কম উপভোগ্য হবার কথা নয়। সেদিনের গানের বিষয় ছিল 'শূর্পণখা—মধু দৈত্য'! দুরু দুরু বুকে রমেশ শীল জীবনের প্রথম গানের আসরে নেমে পদ দিয়েছিলেন:

উৎসাহ আর ভয়
লজ্জাও কম নয়
কেবা থামাইবে কারে?

১। Marxism & Poetry—George Thomson, Pp. 26, 29

২। পূর্ণেন্দু দস্তিদার, পূর্বোল্লিখিত। কল্পতরু সেনগুপ্ত লিখছেন, ঘটনাটি ঘটে ১৩০২ সালে, রমেশ শীলের বয়স যখন ১৮। তিনি একজন কবিয়ালের নামও 'রূপদাস সরকার' বলে জানাচ্ছেন। গণনাট্য, শ্রাবণ, ১৩৭৪ ও নন্দন, ১৩৮৪ আষাঢ়-শ্রাবণ।

সেদিন হাতে-খড়ি তাঁর ভাল হয়েছিল, কারণ মোহনবাঁশি তরুণ কবিয়ালকে উৎসাহিত করার বদলে আক্রমণ করেছিলেন অশ্লীলভাবে। বিনীতভাবে প্রতিবাদ করাতেও যখন কোন ফল ফললোনা তখন রমেশ শীল বেশ উত্তেজিতই হয়েছিলেন। তাঁর প্রতি-আক্রমণের মুখে বেশ বিব্রত আর নাজেহাল হতে হল সেদিন মোহনবাঁশিকে। সে রাততো বটেই, পরের দিন সারাবেলা ডিঙ্গিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত গড়িয়েছিল লড়াই। অবশেষে শ্রোতাদের থেকে একজন উঠে জোটক দিলেন, অর্থাৎ মিলিয়ে দিলেন দুই কবিকে, তাই রক্ষে। না হলে নিজে থেকে জোটক চাওয়া, প্রাণ চাইলেও, সম্ভব হচ্ছিল না বিখ্যাত মোহনবাঁশির পক্ষে। কারণ তা নিদারুণ লজ্জার ব্যাপার হত। বিশেষত নিজেরই আক্রমণের ঠেলায় যখন এতসব। সেই থেকেই নাম ছড়াল কবিয়াল রমেশ শীলের।

মনে রাখতে হবে লোককবি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার পর রমেশ শীলকে সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবার জন্য কবিগানের চিরাচরিত ধারাকেই মেনে নিতে হয়েছিল প্রথমে। তখনকার দিনে কবিগানের বিষয়বস্তু ধর্ম ও ধর্মীয় উপাখ্যান সংক্রান্ত হওয়াটাই ছিল রেওয়াজ। যেমন এজিদ-হোসেন, রাম-রাবণ, ছন্দক-বুদ্ধদেব, কুরু-পাণ্ডব ইত্যাদি। সুতরাং নতুন কবিয়াল রমেশকে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ—বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মীয় উপাখ্যান পাঠে ও শোনায় মন দিতে হল। সর্বোপরি ইসলাম-সংক্রান্ত পড়াশুনায় নিষ্ঠাবান হতে হয়েছিল তাঁকে বিশেষ করে। কারণ চট্টগ্রাম ছিল মুসলমান-প্রধান অঞ্চল। এইভাবে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে গান গাইতে গাইতে রমেশ শীলের চিন্তা-ভাবনায় ক্রমশঃ এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে যায়। শ্রমজীবী মানুষের উষ্ণ আত্মীয়তায়, লোকসংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যের ধারাতেই পরিপুষ্ট হয়ে উঠতে থাকে তাঁর উদার ধর্মীয় চেতনা। তাই এক সময় (১৯২৩)[১] রমেশ শীল অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন নিবেদনধর্মী সুফীবাদের দিকে। ভক্ত হয়ে যান চট্টগ্রামের ফটিকছড়ী থানার 'মাইজভাণ্ডার শরীফে'র। প্রতি বৎসর সেই পীরের দরগায় যে বার্ষিক ধর্মীয় সমাবেশ হত, মারিফতি গান ছিল তার এক প্রধান আকর্ষণ। একটানা সাত বছর[২] রমেশ শীল লিখলেন অজস্র

১। পূর্ণেন্দু দস্তিদার, পূর্বোল্লিখিত।

২। চাটগাঁয়ের কবিওয়ালা : সুভাষ মুখোপাধ্যায় (আমার বাংলা)

গান, যা ছড়িয়ে পড়ল চট্টগ্রামের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত, সাধারণ মানুষের মুখে মুখে : দেখে যা রে মাইজভাণ্ডারে আজব রঙের ফুল

ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে পড়ে আশেক অলিকুল
ফুলের রং দেখেছে যারা হয়ে গেছে আত্মহারা।
দুনিয়ার সুখ চায় না তারা, চায় না জাতির কুল।

মন অহঙ্কারে দিন কাটালি মানুষ হবি কেমন করে
তোর সাধন ভজন নষ্ট হল, হিংসা নিন্দা অহঙ্কারে।
জেলে ধোপা মুচি জাতি, এক সকল ব্যবসার খ্যাতি
মূলে সকল মানুষ জাতি, আর জাতি নাই এই সংসারে।

কিংবা

মন রে এদেশেতে প্রেমিক নাই চলরে প্রেমিকের দেশে যাই।
...সাম্য মৈত্রী করুণার যে দেশ
...যেই দেশে নাই ঘৃণা লজ্জা ভয়
নাই হিংসা নিন্দা মান অভিমান, প্রেমিক তথা রয়,
নাই জাতের বিচার সব একাকার ছোট বড় চিহ্ন নাই।

এই পর্বে রমেশ শীল একথা বুঝতে পারেন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে যে প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁর সমাজে মানুষে মানুষে বিরোধ বা ব্যবধানের পিছনে অন্ততঃ কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ থাকবার কথা নয়। এই উপলব্ধিটুকুই ছিল যথেষ্ট। কারণ তা-ই পরবর্তীকালে পরিণতি লাভ করে সহজতর করে তুলেছিল তাঁর শ্রেণীসচেতনতার উন্মেষ। তা-ই তাঁকে অনুপ্রাণিত করে সামাজিক অসাম্য ও অন্যায়ের শ্রেণী-উৎসটুকু বুঝে নিয়ে নিজের সঠিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে। উদার বিশ্বজনীন ধর্মচেতনা ও ভ্রাতৃত্ববোধ থেকে যে রমেশ শীল একসময় 'মাঝভাণ্ডারের মাঝি' হিসাবে পরিচিত হয়েছিলেন এবং গান লিখেছিলেন,

হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্ব কোন্ কথায় সাধনায়
...একটি গুরু জগত জোড়া, এক পিতারি ছেলে মোরা
যার যেইটি ভজনের ধারা আপত্তি কি আছে তায়...

তিনি পরবর্তীকালে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় শত্রু মিত্র চিহ্নিত করে লিখলেন

হিন্দু মুসলিম মারামারি দেশে এল কি ঘটনা
যত কুলী মজুর গরীব মরে, নেতারা ত কেউ মরে না

বাঘে ছাগে সাপে ভেকে সম্বন্ধ কি ভেবে চাওনা
গরীব আর বড়লোক দোঁহে সেই সম্বন্ধ ভুল হবে না।

বলা চলে দ্বিতীয় রমেশ শীল হলেন প্রথমজনেরই বিকশিত ও পরিণততর রূপ।

কিন্তু কবিয়াল হবার স্বপ্নের তলে তলে যে রূঢ় সত্যটুকু মাথা.চাড়া দিয়ে উঠেছিল, যুবক রমেশ শীলের সামনে তা হল কবিগানের এক বিকৃত অবক্ষয়ী ধারা। সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণের মুখে তিলে তিলে শ্মশানে রূপান্তরিত গ্রাম-সমাজে লোক-কবিদের প্রাণধারণের মরণপণ প্রচেষ্টার মধ্যেই এই ধারার জন্ম। যে কবিয়ালরা উদ্‌গ্রীব জনতার চোখে চোখ রেখে অনুপ্রাণিত হতে অভ্যস্ত ছিল, অভ্যস্ত ছিল সুরে শব্দে জনতার হৃদয়ের সঙ্গে সেতুবন্ধন ঘটাতে, তারাই প্রাণ ধারণের গ্লানি নিয়ে এক সময় গ্রাম শহরের জমিদার মহাজন মুৎসুদ্দিদের সুরা ও সাকীর আড্ডায় কবিগানকে উপস্থিত করল বাইজীর বেশে। বদ বাবুদের মন জোগাতে চালাল প্রাণান্তকর প্রয়াস, ছিটোলো খেউড় ও লহর গানের অশ্লীলতার পাঁক। পরবর্তীকালে কবিগানের চরিত্রে রমেশ শীল বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছিলেন সম্ভবতঃ এই কারণেই যে এক সময় তিনি নিজেও ছিলেন এদেরই একজন, সুখদুঃখের শরিক, সহযাত্রী। এই সময়ের কথাই স্মরণ করেছিলেন তিনি তাঁর পরবর্তীকালের এক বিখ্যাত ভাষণে:'...গ্রামের চাষী গরীব হইল, ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিল জমিদার মহাজনের দল, চাষীরা আর গ্রাম্য কবি ও লোকশিল্পীদের অন্নসংস্থান করিতে পারে না। গ্রাম্যকবিগণ পেটের দায়ে এবং মোটা অর্থের প্রলোভনে জমিদার মহাজনদের উৎসব মণ্ডপে আসিয়া ভিড় জমাইল। বাউণ্ডুলে ইয়ার-দোস্ত পরিবৃত ধনী জমিদার বাবুদের মনোরঞ্জন করিতে গিয়া গ্রাম্য কবিগণ অশ্লীল ভঙ্গীতে নাচিল, গান গাহিল। নারী জাতির কুৎসা রটনা করিয়া তথাকথিত পুরুষ পুঙ্গবকে পরিতৃপ্ত করিল। আমার ব্যক্তিগত কবিজীবনে অসংখ্য বার এই ভাবে নাচিয়াছি। অশ্লীল গান গাহিয়াছি...।' এই অসামান্য আত্মসমীক্ষা তো শুধু কবিয়ালের নয়, একে বলা যায় সমগ্র কবিগানের ঐতিহ্যেরই স্বীকারোক্তি। এবং বলাই বাহুল্য কবিগানের এই চিতাভস্ম থেকেই রমেশ শীল এক সময় কিংবদন্তীর পাখীর মতন উঠে দাঁড়িয়েছিলেন নবজাগ্রত চেতনা নিয়ে। অথচ, এই মৃত্যুত্তীর্ণ কবিওয়ালাদেরই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'নষ্টপরমায়ু কবির দল'। রবীন্দ্রনাথ শুধু মৃত্যু দেখেছিলেন কবিগানের, মৃত্যুর সঙ্গে তার পাঞ্জা লড়াটুকু দেখেননি, দেখেননি তার পুনর্জন্ম। গণসংস্কৃতির প্রতিনিধি রমেশ শীলের সঙ্গে

নাগরিক সংস্কৃতির নায়ক রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধ ও দূরত্বটুকু হয়ত এইখানেই।

কিংবদন্তীর পাখী

রমেশ শীল চোখের উপর দেখেছিলেন দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রমেশ কি কি গান বেঁধেছিলেন তার প্রায় কিছুই জানা যায় না। শুধু চারটি লাইন তাঁর মনে ছিল বৃদ্ধ বয়সেও :

পাঁচ গজ ধুতি সাত টাকা
দেহ টেকা হয়েছে কঠিন
রমেশ কয় আঁধারে মরি
পাইনা কেরোসিন।

কবিগানের প্রচলিত ধারার শরিক হলেও 'ব্যক্তিগত কবিজীবনে'র প্রথম পর্বেও রমেশ শীলের অবস্থানভূমিটুকু কোথায় ছিল তা এই ক'টি লাইনই নিঃসন্দেহে বুঝিয়ে দেয়। বোঝা যায় গণজীবনের কোন সংকটেই তাঁর ক্ষেত্রে কখনো নিস্পৃহ, নিরপেক্ষ থাকার প্রশ্ন ওঠেনি। আজীবন তিনি ছিলেন নিরন্ন সংগ্রামী জনতার পক্ষে। আর এই পক্ষপাতিত্বটুকুই ছিল তাঁর সুদীর্ঘ কবিয়াল জীবনের দিকনির্দেশক কম্পাস, যা তাঁকে নিরন্তর গণমুখী রেখেছে, রূপান্তরিত করেছে গণকবিয়ালে।

দুটি গণআন্দোলন এরপর রমেশ শীলের উপর প্রভাব বিস্তার করে। প্রথমটি হল আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের ধর্মঘট, যা কবির নিজের চোখে দেখা। দ্বিতীয়টি খিলাফৎ আন্দোলন। রেল ধর্মঘটটি ছিল চট্টগ্রামের বুকে 'প্রথম রাজনৈতিক ধর্মঘট'।[১] ঘটনা ঘটেছিল এই রকম [২] : মালিক শ্রেণীর শোষণের ভয়ঙ্কর জালের মধ্যে পড়ে আসাম অঞ্চলের চা-বাগানগুলোয় চা-শ্রমিকদের জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ। তাঁরা এক সময় একজোটে বাগান ছেড়ে যে যার ঘরে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন এবং দাবী জানান এই মর্মে। কিন্তু ব্যাপার এতই গুরুতর আকার নেয় যে করিমগঞ্জের কিছু ইউরোপীয় কর্তাব্যক্তি তাঁদের কাছে কোন রেল টিকিট বিক্রী না করার নির্দেশ পর্যন্ত জারী করে বসে। চা-শ্রমিকেরা তখন নিরুপায় হয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়ার জন্যই প্রস্তুত হলেন। পরে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের আবেদন

১। পূর্ণেন্দু দস্তিদার : কবিয়াল রমেশ শীল

২। G. Adhikari : Documents of the C. P. I. Vol. I. Pp 321-322

নিবেদনে তাঁরা টিকিট পেলেও কর্তৃপক্ষ নিতান্তই বেআইনী ভাবে তাঁদের ৬৭০ জনকে চাঁদপুর স্টেশনে আটক ক'রে বর্বর আক্রমণ চালায়। গোয়ালন্দেও একহাজারের মতন চা-শ্রমিককে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। এই সব বর্বরতার প্রতিবাদেই আওয়াজ উঠল আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘটের, শ্রমজীবী শ্রেণীর একতাবোধ থেকে যার সঙ্গে হাত মেলালেন রিভার নেভিগেশান কোম্পানীর কর্মীরাও। বিদেশী শাসকের মুখের উপর সংগ্রামী মানুষের এই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়ার মতন ঘটনা রমেশ শীলকে উদ্বুদ্ধ না করে পারে না। ব্রিটিশ ভারতে ঔপনিবেশিক শোষণ আর পরাধীনতার যন্ত্রণার যে তীব্র উপলব্ধি কবিয়ালের ছিল, তারই একটি তুলনারহিত প্রকাশ ঘটে সেই সময়কারই এক গানে :

আর যায় না চুপ করে থাকা
যতীন্দ্রবাবুর নেতৃত্বে বন্ধ হবে রেলের চাকা
মজদুরের একতা জোরে, রেলের বিটে মরিচা পড়ে
আমার রক্তে উদর পুরে, আমাকে ডেম ব্লাডি ডাকা।

পরবর্তীকালে পূর্বভারতীয় রেল ধর্মঘটের মূল্যায়ন করতে গিয়ে 'দি ভ্যানগার্ড' পত্রিকা (১৫ই মে, ১৯২২) আসাম বেঙ্গল রেল ধর্মঘটের কথা স্মরণ করে বলেছিল, এ ঘটনা দুটি জিনিসকে সামনে নিয়ে এসেছে। এতে যেমন একদিকে গণ-আন্দোলনের শক্তির প্রকাশ দেখা গেল, তেমনি দেখা গেল অন্যদিকে লড়াই-এর প্রকৃত চরিত্র-বুঝতে-অক্ষম নেতৃত্বের পরিচালনায়, অথবা ভ্রান্ত পরিচালনায়, সেই শক্তিরই অপচয়। প্রমাণিত হয়ে গেল সংকটের মুহূর্তে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় মধ্যবিত্ত মানবতাবাদীদের অক্ষমতা।[১] প্রসঙ্গত এ কথাও ভুললে চলবে না যে প্রবাসে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি সবে মাত্র তৈরী হলেও তখনও এদেশের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি কমিউনিস্ট পার্টি, গড়ে ওঠেনি ভারতীয় শ্রমিক কৃষক সংঘ (ওয়াকারস এণ্ড পিজান্টস পার্টি অফ ইণ্ডিয়া)। তাই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে অর্থাৎ 'শ্বেতাঙ্গ দুশমনের হাত' থেকে উদ্ধার পাবার জন্য 'কৃষক মজদুর ঐক্যে'র যে একমাত্র সম্ভাব্য পথ সামনে দেখেছিলেন রমেশ শীল, তা সম্পাদন করবার জন্য সঠিক নেতৃত্ব তখনও দানা বাঁধেনি ভারতবর্ষে। যদিও পরবর্তীকালের ইতিহাসও এক্ষেত্রে থেকে গেছে প্রধানত নেতিবাচক।

১। Ibid, P. 435

বিশের দশক : খিলাফৎ

দ্বিতীয় যে আন্দোলনের ঢেউ বিশের দশকে রমেশ শীলকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা হল খিলাফৎ। তুরস্কের বুকে সে দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য এক জনপ্রিয় জাতীয় সংগ্রাম ছিল খিলাফৎ। তা ছিল 'বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন'। সুতরাং তার প্রতি সমর্থন জানানোটাই ছিল সঠিক পদক্ষেপ। কিন্তু ভারতবর্ষে তাৎক্ষণিক সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে তখন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল প্রধানত খিলাফতের ধর্মীয় চরিত্রের উপর, যা কিনা খোদ তুরস্কেই দ্রুত ধার হারিয়ে সংগ্রামের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাতিল বলে গণ্য হয়ে গিয়েছিল। খিলাফৎকে আশ্রয় করে 'হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে'র আওয়াজ ওঠে। কিন্তু পরশাসনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এ দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশকে কোন্ কোন্ উপাদান চূড়ান্ত ভাবে দূষিত করেছিল তা আমাদের অজানা নয়। একদিকে যেমন ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির 'বিভেদনীতি ও শাসন,' তোষণ ও শোষণ নীতির সুচতুর প্রয়োগ, অন্যদিকে তেমনি ছিল হিন্দু উচ্চশ্রেণীর উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী ও মুসলিম উচ্চশ্রেণীর উগ্র মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন। এবং সর্বোপরি ছিল উভয়েরই ব্রিটিশের সঙ্গে বিরোধের মধ্য দিয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকার নীতি। তাই যখন পরস্পরের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের ভিত্তিতে সর্বভারতীয় খিলাফৎ কমিটির সঙ্গে গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের সংযোগ স্থাপিত হল তখন তা নিছকই কৌশলগত আপস ছিল, অতিরিক্ত কিছু নয়। 'হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে'র দিক থেকে দেখতে গেলে এ ছিল ভীষণ ভুল পদক্ষেপ। যেহেতু জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের কোন বাস্তবসম্মত কর্মপদ্ধতি নয়, নিতান্তই অনির্ভরযোগ্য ধর্মীয় ভাবাবেগ ছিল সেই কৃত্রিম ঐক্যের ভিত্তি, তাই তার ভয়ঙ্কর পরিণতিও ছিল একরকম অনিবার্য। তবে আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না যখন দেখি মুজফ্‌ফর আহমদ ও নজরুল ইসলাম সম্পাদিত সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' পর্যন্ত তার সম্পাদকীয়তে লিখেছিল : 'আমরা নিজেরা মুসলমান। তাই ইসলামের সমর্থন আমরা করব এবং আমাদের সহধর্মীদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে আমরা দেব ভাষা…আরবীয় উপদ্বীপ খলিফার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ও…রাজ্যাদি ফিরে না পাওয়া অবধি এই আন্দোলন চালিয়ে যাবে 'নবযুগ'। এটা পুরোপুরি ধর্মীয় ব্যাপার। এর জন্য আমরা অসহযোগের কর্মনীতি পর্যন্ত

অনুসরণ করতে তৈরী' (জুলাই ১২, ১৯২০)।[১] অথচ আমরা জানি খিলাফৎ আন্দোলনের তীব্র সমালোচনা করার পর 'দি ভ্যানগার্ড' পত্রিকায় (অক্টোবর, ১০ ১৯২৩) 'হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও স্বরাজ সংক্রান্ত ইস্তাহার' ভারতের বুকে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি জোরের সঙ্গে তুলে ধরেছিল প্রধানতঃ যে কারণ দেখিয়ে, তা হল 'শ্রমিক শ্রেণীর দর্শনে সমৃদ্ধ এই পার্টিই একমাত্র সমস্ত ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের উপর অর্থ-রাজনৈতিক প্রশ্নের প্রাধান্যের স্বীকৃতি দিতে সক্ষম হবে।' সর্বাংশে সত্য এই বক্তব্যের ভিত্তিতেই 'ইস্তাহার' মন্তব্য করেছিল, 'এমন একটি দল গঠনের কাজ স্থগিত রাখার প্রতিটি দিনই কয়েক বছর করে পিছিয়ে দিচ্ছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা।' অবশেষে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৫-এ। আর তার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা যে ছিলেন মুজফ্ফর আহমদ সেকথা কে না জানে। 'নবযুগে'র সঙ্গে, বলাই বাহুল্য, কোন সম্পর্কই তখন তাঁর ছিল না।

চোখ ফেরানো যাক রমেশের দিকে। তলে তলে সঙ্কীর্ণ স্বার্থ হাসিল করার জন্য হলেও কংগ্রেস ও খিলাফৎ কমিটি যখন 'হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে'র আওয়াজ তুলেছিল তখন কিন্তু দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের সঙ্গে রমেশ শীলের রক্তেও লেগেছিল অকৃত্রিম দোলা। খিলাফৎ পুনরুদ্ধারের দাবীকে সামনে রেখে ঔপনিবেশিক শোষণে জর্জরিত হিন্দু-মুসলমান ভারতবাসী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুক্তি সংগ্রামে সামিল হবে—একথা তিনি বিশ্বাস করেছিলেন গভীর আবেগের সঙ্গেই। তারই দৃপ্ত প্রকাশ ঘটেছে একটি গানে :

আমাদের চোখ ফুটেছে মুখ ছুটেছে ভয় করি না
ব্রিটিশ নিল দেশ লুটিয়া, উঠছে মোদের চোখ ফুটিয়া
আমরা আর থাকব না চেয়ে কুকুর খাবে দুধের ছানা
দেখে তোদের চোখ রাঙানি মনে কি আতঙ্ক গণি ?
ঢোঁড়া সাপের ফোঁস ফোঁসানি আমরা কিরে ভেকের ছানা ?

প্রথম অংশের এই তেজটুকু নিষ্প্রভ হয়ে আসে গানের শেষের দিকে। বলা বাহুল্য তার মধ্যে তৎকালীন খিলাফৎ নেতৃত্বের চেহারাই প্রতিফলিত :

খলিফাকে গদি দিবি, নয়ত এবার বিলাত যাবি
এই দুইটার একটা হবে, হিন্দু-মুসলিম মাফ করবে না।

ত্রিশের দশক : বিদ্রোহী চট্টগ্রাম

বিশের দশকের দুটি (আসাম বেঙ্গল রেল ধর্মঘট ও খিলাফৎ) গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে ত্রিশের দশকে পৌছুলেন রমেশ শীল। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের দেশ চট্টগ্রামে মোহনদাস গান্ধী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন তার প্রত্যাশিত আলোড়নই সৃষ্টি করেছিল। আর মুসলমান-প্রধান চট্টগ্রামে খিলাফৎ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াটুকুও অনুমান করা কিছু কঠিন নয়। কিন্তু চৌরিচৌরায় আক্রান্ত জনতার সংগ্রামী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ, পুলিশ চৌকি আক্রমণ, অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে (৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯২২) উপলক্ষ্য করে গান্ধী নেতৃত্ব তড়িঘড়ি সেই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়ে কবর রচনা করেছিল গণআন্দোলনের। অন্যদিকে কামাল আতাতুর্কের তুরস্কে খলিফার পদটিই যখন বিলুপ্ত হয়ে গেল (১৯২৪) তখন নিছকই খলিফার গদি ফিরে পাওয়ার দাবীকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এদেশের খিলাফৎ আন্দোলনও লাভ করেছিল তার স্বাভাবিক পরিণতি। উভয় আন্দোলনেরই এই শোচনীয় ব্যর্থতা যথেষ্ট মোহমুক্ত করেছিল চট্টগ্রামের মানুষকে, প্রস্তুত করেছিল সন্ত্রাসবাদের মাটি, জন্ম দিয়েছিল ত্রিশের দশকের। হসরৎ মোহানী এক সময় কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনে (১৯২১) 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র প্রস্তাব উত্থাপন করলে গান্ধী প্রস্তাবটিকে 'দায়িত্ব-জ্ঞানহীন' 'বেদনাদায়ক' বলে চিহ্নিত করে অগ্রাহ্য করেছিলেন। তারপর থেকে কংগ্রেসের প্রায় প্রতি অধিবেশনেই এ জাতীয় প্রস্তাব উঠেছে এবং বাতিল হয়ে এসেছে নিয়মিত। অন্যদিকে আপসপন্থী গান্ধী-রাজনীতির প্রতি দেশের মানুষের অনাস্থা এবং বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতে থাকে ক্রমাগতভাবে। তারই পরোক্ষ প্রতিক্রিয়ায়, বলা চলে, জন্ম হল স্বরাজ্যদলের। এর মোকাবিলা করার জন্য অবশেষে স্বয়ং গান্ধী পর্যন্ত বাধ্য হলেন লাহোর কংগ্রেসে (১৯২৯) 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র প্রস্তাব মেনে নিতে। কিন্তু এই কয়েক বছরের মধ্যে রমেশ শীলের চট্টগ্রামে রাজনৈতিক প্রভাবের পালাবদল ঘটে গেল। চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের অন্যতম নেতা অনন্ত সিংহ লিখেছেন : 'দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন গান্ধীজীর মতবাদ ও 'Dominion Status' প্রস্তাবের অনুগত ও সমর্থক ছিলেন।...যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে আমরা বুলক্ ব্রাদার্স ও আসাম বেঙ্গল রেল ধর্মঘট সার্থকতার সঙ্গে পরিচালনা করেছিলাম।... তবু আমরা বাংলা কংগ্রেসের নির্বাচন দ্বন্দ্বে যতীন্দ্রমোহনকে সমর্থন করতে পারিনি।

আমরা আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করে জয়ী হই'।[১] এরই সঙ্গে সঙ্গে চলছিল সশস্ত্র সংগ্রামের গোপন প্রস্তুতি। ১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০-এ ঘটল তার চূড়ান্ত বিস্ফোরণ—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের ঐতিহাসিক ঘটনা। চারদিন পরে ২২শে এপ্রিল হল জালালাবাদ পাহাড়ের বুকে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহী-দের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ।

বীরত্ব ও আত্মত্যাগের প্রতি লোক-কবিদের আকর্ষণবোধ একটি স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার। তাই খোঁজ নিলে দেখা যাবে একজন অকুতোভয় সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীর আত্মোৎসর্গী মূর্তি লোককবির কল্পনা ও আদর্শবোধকে যত সহজে উদ্দীপ্ত করতে পেরেছে, একজন খদ্দর-পরিহিত চরকাচালক অসহযোগী পারেনি তার এক শতাংশও। ক্ষুদিরামের মতন সন্ত্রাসবাদী যুবকদের নিয়ে লোক-কবিদের যে সব গান, তাঁদের দেশপ্রেম, সাহস, আত্মত্যাগের যে সব গল্প লোকমুখে মুখেই এক সময় ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের সর্বত্র, তা রমেশ শীলও শুনেছিলেন অসীম আগ্রহ নিয়ে। তাঁর সেই শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের প্রকাশ দেখা যায় সমকালীন একটি গানে :

…থাকতে তেত্রিশ কোটি ভ্রাতা, সঙ্গী ফেলে
একা হল ক্ষুদিরামের ফাঁস
মোরা যত বঙ্গবাসী শোকনীরে ভাসি
নরেন গোঁসাই হল স্বার্থের দাস
কানাইলাল সত্যেন বোসে দোষী হল
দেশকে ভালবেসে,
উভয়ের গলায় পড়ল ফাঁস
ভাবি বুদ্ধির কি কৌশল,
কাঁঠালে পিস্তল নিয়ে
করল দেশের শত্রুর জীবন নাশ।

অবশেষে এই গল্পের মানুষদেরই যখন দেখা গেল চট্টগ্রামে, রমেশ শীলের প্রিয়ভূমি চট্টলার বিদ্রোহী তরুণদের হাতেই যখন গর্জে উঠল আগ্নেয়াস্ত্র, আক্রান্ত হল অস্ত্রাগার, ভয়ঙ্কর খণ্ডযুদ্ধ হল ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে, তখন শ্রদ্ধা ও গর্বের মিশ্রকণ্ঠে রমেশ গান গেয়েছিলেন :

১। চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহ : অনন্ত সিংহ (দ্বিতীয় খণ্ড), ১৯৬৮ সং, পৃঃ ২৩৬

…বাজিয়া উঠিল রণের ভেরী দিক দিগন্ত উজলা
কোটি কণ্ঠে ধ্বনিত হইল বীর প্রসবিনী চট্টলা !
সেই বীরের দেশে জন্ম নিয়েছি পূর্ণ হয়েছে মনোসাধ।
শহীদ খুনে রাঙ্গা তুমি জালালাবাদ ! জালালাবাদ।

তরুণদের বীরত্ব, তাদের দেশপ্রেমের কথা তিনি শোনালেন :

…দুশমন হটাতে তব বক্ষ মাঝে
রুখিয়া দাঁড়াল বীরের দল :
হটিয়া গেল বিপক্ষ সেনানী টুটিল তাদের ধৈর্য বাঁধ
সূর্য উঠিল তুর্য নিনাদি তেজস্ক মণ্ডল ভাতিল তায়,
অরুণ বেগে তরুণের দল, কদম কদম এগিয়ে যায়।

তারপর সন্ত্রাসবাদী অভ্যুত্থানের আগুন যখন নিভল তখন সন্ত্রস্ত শাসকের উৎপীড়ক থাবা নেমে আসে চট্টগ্রামের জনজীবনের উপর। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে বহু বিদ্রোহী আন্দামানে ও দেশের অন্যান্য জেলে নিক্ষিপ্ত হলেন। তবুও বিদ্রোহ বা বিদ্রোহীদের সামান্যতম রেশ বা সংযোগসূত্র আবিষ্কার এবং তার বিলোপ সাধনের জন্য পুলিশ মিলিটারী গোয়েন্দাবাহিনীর মাধ্যমে চলল দমননীতির চূড়ান্ত প্রয়োগ। পূর্ণেন্দু দস্তিদার লিখেছেন : 'তখন কিছু কালের জন্য চট্টগ্রামের মানুষ হয়ে গিয়েছিল বাক্যহারা। ভাল কোন সাহিত্য, লেখা, গান, কবিতা তখন রচিত হয়নি। কারণ সেই সময় কবি সাহিত্যিকদেরও দেশপ্রেমের অপরাধে কম লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়নি বিদেশী শাসকদের হাতে।' সেই দমননীতি উপেক্ষা করেও যে রমেশ শীল গান লিখে গিয়েছিলেন তার নজীর আছে চমৎকার। একদিন যাঁদের বীরত্ব, আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে তাকেও অভিভূত করেছিল শ্রদ্ধায় ভালবাসায়, কারান্তরালে চলে যাওয়ার পর তাঁদেরই ছবি জনমন থেকে একটু একটু মুছে যেতে দেখে সেই বিস্মৃত বীরদের নিয়ে ক্ষুব্ধ চিত্তে লিখেছিলেন রমেশ শীল :

চট্টগ্রামের মুক্তিবীর ছিল যারা শান্ত ধীর
কারারুদ্ধ রয়েছে সকল।
গণেশ ঘোষ কল্পনা দত্ত তারা সদা নির্ভিক চিত্ত
সুকর্মেতে ফলিল কুফল
সুখেন্দু দস্তিদার বরণ করে কারাগার।

অগ্রজ শহীদ অর্ধেন্দুর পিছে, কালী চক্রবর্তী সঙ্গে আছে
প্রিয়দা দেশের প্রিয়, সর্বজন বরণীয়
এখন তারা বিস্মরণে রহিয়াছে।

আর একটি গানে :

এবার পূজার আনন্দ দেখলাম দেশে,
মা'র পূজার পূজারী যারা, তারা আছে কারাবাসে।
যাদের গভীর শ্রদ্ধা মা'র পূজায়
তারা আজও রইল জেলখানায়,
…চাষী মজুর বন্ধুগণে বন্দীমুক্তি আন্দোলনে
মুক্ত কর বন্দীগণে সৌভাগ্য আসিবে দেশে।

অসহযোগ ও সন্ত্রাসবাদমুখর বিশ ও ত্রিশের দশক ধীরে ধীরে রমেশ শীলকে পৌঁছে দিল তাঁর কবিয়াল জীবনের সব চাইতে গৌরবময় ভূমিকায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও দেশবিভাগ-কবলিত চল্লিশের দশকে। বলাবাহুল্য এই ভূমিকা পালনে চট্টগ্রামে একা ছিলেন না রমেশ। অন্যান্য যাঁরা ছিলেন তাঁরাও বিকশিত ও সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন তাঁরই নেতৃত্বে। কবিয়াল সংস্কৃতির অতীত ও পরবর্তী ইতিহাসের দিক থেকে দেখতে গেলে ১৯৩৮-এ[১] রমেশ শীলকে সভাপতি করে 'রমেশ উদ্বোধন-কবি-সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঘটনাটি ছিল বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। জমিদার মহাজন শ্রেণীর বিকৃত রুচির কাছে আত্মসমর্পণ আর নয়। নিজেদের ভূমিকা তাঁরা স্থির করে নিলেন : একদিকে অবক্ষয়ী সামন্ত-তান্ত্রিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে গড়ে তুলবেন প্রতিরোধ, অন্যদিকে সচেষ্ট থাকবেন সংগ্রামী মানুষের দৈনন্দিন জীবনচর্চার সঙ্গে কবিগানকে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কে যুক্ত করতে। তাঁরা কবিগানের বায়না নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধ মারামারি বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে কবিগানকে সাধ্যমতন অশ্লীলতা-মুক্ত করার প্রতিজ্ঞাও গ্রহণ করলেন।

১। পূর্ণেন্দু দস্তিদার, পূর্বোল্লিখিত। কিন্তু শ্রীহেমাঙ্গ বিশ্বাসের কাছে 'চট্টগ্রাম জেলা কবি সমিতি' প্রেরিত তথ্যে '১৯৪০' সনের উল্লেখ রয়েছে। ১১জন সদস্যকে নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়। সদস্যরা হলেন—(১) রমেশ শীল—সভাপতি (২) ধীরেন্দ্রলাল সেন—সম্পাদক (৩) হেদায়ত ইসলাম খাঁ সহ-সভাপতি (৪) নগেন্দ্র-চন্দ্র দে—কোষাধ্যক্ষ (৫) ফণীন্দ্রলাল বড়ুয়া (৬) রাইগোপাল দাস (৭) মণীন্দ্র দাস (৮) গোবিন্দচন্দ্র দে (৯) বরদা দে (১০) তারাচরণ দাস (১১) সারদাচরণ বড়ুয়া।'

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও জনযুদ্ধ

১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতায় সমগ্র বিশ্বে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীই সর্বপ্রথম মঞ্চে নামলেন। ১৯৩৯-এর ২রা অক্টোবর বোম্বাই-এর ৯০ হাজার শ্রমিক করলেন ধর্মঘট।[১] এ ছাড়াও যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে (১৯৪০) কেবলমাত্র বোম্বাই শহরেই দেড় লক্ষ শ্রমিক দুর্মূল্যভাতা আদায়ের জন্য লাগাতার ৪০ দিন ধর্মঘট চালিয়ে, দাবী আদায় তো বটেই, যুদ্ধরত সাম্রাজ্যবাদকে অর্থনৈতিক দিক থেকেও কিছুটা ঘায়েল করতে সফল হলেন। অন্যদিকে জাতীয় কংগ্রেসের যে নেতৃবর্গ যুদ্ধের কিছু আগে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন, যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর তাঁরাই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতার পরিবর্তে আপসের পথ খুলে রাখতে তৎপর হলেন। কংগ্রেসের ওয়ার্ধা অধিবেশনে যুদ্ধ সম্পর্কে কোন স্পষ্ট বক্তব্য রাখার বদলে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ব্রিটেনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঘোষণা করার দাবীই শুধু জানানো হয়। পরবর্তীকালেও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কোন সক্রিয় প্রতিরোধ নয়, তাঁরা কেবল 'অসহযোগিতা'র পথ ধরে ধ্বনি তুলেছিলেন, 'এ যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী, এতে না এক পাই না এক ভাই'। তবে ভুললে চলবে না ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন আপসপন্থী নেতৃত্বও গলা মিলিয়েছিলেন এই ধ্বনির সঙ্গেই। শ্রমিকশ্রেণী যে পথ দেখিয়েছিল, বিপ্লবী সততার সঙ্গে তা অনুসরণ ও সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে তাকে উত্তরোত্তর সংগ্রামমুখী করে না তুলে নেতারা বড় বড় তাত্ত্বিক কথাবার্তার ধূম্রজাল সৃষ্টি করলেন। আর গান্ধীর উপরই ছেড়ে দিলেন সংগ্রামের সম্পূর্ণ দায়িত্ব। তাঁরা বললেন, 'আমরা এখন এরূপ প্রচণ্ড সংগ্রাম আরম্ভ করতে পারি যার গতিরোধ করা সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না।' বলাই বাহুল্য 'কংগ্রেসই সংগ্রাম আরম্ভ করবে'। তবে তাও যেহেতু সহজে হবার নয়, তাই কংগ্রেসের উপর চাপ সৃষ্টি করার গুরুদায়িত্ব নিয়ে 'বড় বড় সভা ও শোভাযাত্রা করবে' কমিউনিস্ট পার্টি।[২] যুদ্ধ সম্পর্কে কৃষকসভারও যে নীতি নির্ধারিত হয় তা কিছুটা ভিন্ন সুরের হলেও আক্রমণাত্মক ছিল না—

১। কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের রূপরেখা : বিজন সেন (কালপুরুষ, সংখ্যা ৬-৭, ১৯৬৯)।

২। ঐ।

ছিল অসহযোগাত্মক। অন্ধ্রপ্রদেশের পালসায় সারা ভারত কৃষকসভার প্রথম সম্মেলনে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয়, '…অতি সত্বর এমন এক দেশব্যাপী ট্যাক্স-বন্ধ ও খাজনা-বন্ধ আন্দোলন সংহত করতে হবে যা সাম্রাজ্যবাদের এই সমস্ত পরগাছাগুলির অর্থনীতিক ক্ষমতাকে খতম করতে পারে এবং এদেশে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের রাজনীতিক শক্তিকে কাঁপিয়ে দিতে পারে।'[১]

যাই হোক দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ ১৯৪১-এর মাঝামাঝি সময়ে গিয়ে নিয়ে নিল ভিন্ন চেহারা। ব্রিটেনের যুদ্ধে সুবিধা করতে না পারলেও একে একে পোল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, নরওয়ে, ফ্রান্সকে পায়ে দলে ফ্যাসিস্ট হিটলারের জার্মানী অবশেষে ১৯৪১-এর জুন মাসে আক্রমণ চালাল সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার উপর। রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের রূপান্তর ঘটল বটে, কিন্তু দেশীয় পরিস্থিতিতে, বিশেষতঃ কোন ঔপনিবেশিক দেশে কমিউনিস্ট পার্টির কি নীতি গ্রহণ করা উচিত হবে তা নিয়েই লেগে গেল ভীষণ বিতর্ক। মিত্রপক্ষে যুদ্ধরত ব্রিটেনের যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে বিপন্ন করে ভারতীয় জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম অব্যাহত রাখাটা ঠিক না বেঠিক—এই হয়ে দাঁড়াল প্রধান প্রশ্ন। ডাঙ্গে, মুজফ্ফর আহ্মদ, রণদিভে, অজয় ঘোষ প্রমুখ দেউলী জেলে বন্দী কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ তাঁদের 'দেউলী দলিলে' 'জনযুদ্ধে'র শ্লোগান দিয়ে ব্রিটিশ যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানাবার প্রস্তাব তুললে তা জেলের বাইরেকার নেতৃত্বের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল ভিন্ন প্রতিক্রিয়া। কারণ হয়ত এই যে, কারাগারের বাইরেকার পার্টি-নেতৃত্বের পক্ষে অশান্ত দেশবাসীর উত্তাল আকাঙ্ক্ষার মধ্যে থেকে তাকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না মোটেই। পলিটব্যুরো জুলাই, ১৯৪১-এর প্রস্তাবে বলেছিল, 'সোভিয়েত ইউনিয়নকে আমরা স্বাধীন মানুষ হিসাবেই সব চাইতে কার্যকরী সাহায্য করতে পারব'। ১৯৪১-এর অক্টোবর মাস পর্যন্ত 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড' কমিউনিস্ট পার্টি থেকে দেউলী কমিউনিস্টদের তীব্র আক্রমণ করে বলা হয়েছিল : 'সাম্রাজ্যবাদীদের উপর নয়, জনগণ ও শ্রমিক শ্রেণীর উপর আস্থাই হল প্রকৃত আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রাণ…যারা বলে যে আমরা বৃটিশ সরকারের যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে সোভিয়েতের পাশে থাকতে পারি অথবা জনগণের জন্য যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারি—তারা জনগণের প্রতারক, তারা ভণ্ড আন্তর্জাতিকতা-

১। কৃষক সভার ইতিহাস : আবদুল্লাহ রসুল, পৃঃ ১০১।

বাদী।[১] কিন্তু আশ্চর্য, মাত্র দু'মাস যেতে না যেতেই পাল্টে গেল মতটা। ১৯৪১-এর ১৫ই ডিসেম্বর পলিটব্যুরো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম 'জনযুদ্ধের নীতি আঁকড়ে ধরলো। বলল, 'আমাদের পার্টির প্রধান শ্লোগান···হল: জনযুদ্ধে ভারতীয় জনগণকে জনগণের ভূমিকা পালন করাও।'

প্রকৃত ভূমিকা নিয়েই বাধল আসল গোলমাল। জনগণের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে সশস্ত্র গণবাহিনী গ'ড়ে ফ্যাসিবাদকে রোখা যেখানে ছিল নিতান্তই দরকার, সেখানে পার্টি নেতারা চাইলেন ব্রিটিশকে ঢাল তলোয়ারে সুসজ্জিত ক'রে তাকে দিয়েই ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধটুকু সেরে ফেলতে। অর্থাৎ উদ্‌যোগটা তাঁরা জনগণের হাতে না রেখে এক কথায় ছেড়ে দিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাতে, আর নিজেরা বৃটিশের লেজুড়বৃত্তিতেই করলেন মনোনিবেশ।

একটা 'সুফল' পাওয়া গেল হাতে হাতেই।

দীর্ঘকাল নিষিদ্ধ থাকার পর ১৯৪২-এর জুলাই মাসেই পার্টি পেয়ে যায় আইনী ছাড়পত্র। আন্তর্জাতিকতার দোহাই দিয়ে দেশীয় পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে সর্বতোভাবে সাহায্য এবং সরকারের পিছনে সমস্ত রাজনৈতিক দলের সমর্থন সংগ্রহ করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি তৎপর হল। তার জন্য বিচিত্রভাবে 'জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণে'র তত্ত্ব খাড়া করে পার্টির নেতারা মুসলীম লীগের পার্টিশান-সংক্রান্ত প্রস্তাবকে পর্যন্ত মদত দিল। অন্যদিকে গান্ধীর 'ভারত ছাড়ো' ('৪২) আন্দোলনকে সমর্থন না করলেও, সমানে চালাল তোষামোদী। 'লীগ-কংগ্রেস এক হও' জাতীয় আওয়াজও তুলল একসময়। যুদ্ধপ্রচেষ্টার অনুকূলে সমস্ত কিছুকে আনাটাই ছিল যেহেতু লক্ষ্য তাই শ্রমিক বা ছাত্রের ধর্মঘটের বিরোধিতা করাও হয়ে দাঁড়াল পার্টির নীতি, কারণ তা উৎপাদনকে ব্যাহত করার সঙ্গে সঙ্গে দেশের আইন-শৃঙ্খলাকে বিপন্ন করতে পারে।

সুতরাং আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে, তত্ত্বগত স্তরে দেউলী দলিলে প্রস্তাবিত 'জনযুদ্ধে'র মূল ধারণাটি সঠিক হলেও স্বদেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির হাতে তা পরিণত হয়েছিলো আত্মসমর্পণের লাইনে। মোটামুটি একই পরিস্থিতিতে ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টি কিন্তু একসঙ্গে দুই শত্রু—ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ ও জাপানী ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর লাইন অনুসরণ করেছিল।

১। Overstreet and Windmiller—Communism in India.

জাপানী ফ্যাসিস্টদের তাঁরা একমাত্র শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন তখনই, যখন 'ইন্দোচীনের একচ্ছত্র অধিপতি হবার অভিলাষে জাপানীরা ফরাসীদের বিরুদ্ধে এক আচমকা অভ্যুত্থান ঘটায় ৯ই মার্চ, ১৯৪৫।'[১] যাই হোক এই ভ্রান্ত, আত্মসমর্পণ-বাদী লাইন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে ভয়ংকরভাবে বিচ্ছিন্ন করল জনসাধারণ থেকে, কবর খুঁড়ল তার রাজনৈতিক ভবিষ্যতের, ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করল দেশের অসংখ্য মানুষকে। অবশ্য একথাও অনস্বীকার্য যে প্রথমদিকে সাধারণ মানুষের কাছে 'জনযুদ্ধে'র আওয়াজ যতটা আরোপিত ও দূরের ছিল, জাপানের হাতে সিঙ্গাপুরের পতন, বার্মার লড়াই ও অবশেষে ভারতবর্ষের উপর তার আসন্ন আক্রমণের ছায়া যখন পড়ল তখন তা আর ততখানি অনাত্মীয় ছিল না। বিশেষ করে রমেশ শীলের কাছে তো নয়ই, কারণ যুদ্ধফ্রণ্টের নিকটবর্তী চট্টগ্রামের পরিস্থিতি হয়ে পড়েছিল ক্রমশই ভয়াবহ। যাই হোক সেই সময় 'জনযুদ্ধে'র সপক্ষে ব্যাপক প্রচারকার্য চালাবার জন্য পার্টি যে সব পত্রপত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করে তার মধ্যে *People's War* ও 'জনযুদ্ধে'র ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। এই 'জনযুদ্ধ' পত্রিকারই একটি সংখ্যা প'ড়ে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন রমেশ শীল।'...দেশের কথা ঠিক এভাবে জানার কখনও সুযোগ হয়নি। নতুন ভাবে গান লেখার একটা দারুণ সাড়া পেলাম।...এতদিনে একটা রাস্তা পেয়ে গেলাম। ঠিক করলাম সারা চাটগাঁয়ে এবার গান নিয়ে মানুষ জাগাব'।[২] অন্যদিকে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বেশ কিছু কমিউনিস্ট কর্মী সে সময় চট্টগ্রামের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ার একটা সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁদেরই একজন সারদাচরণ শীল। রমেশ শীলের বাড়ী যে থানায় অর্থাৎ সেই বোয়ালখালী থানার কৃষকদের মধ্যে কাজ করতে তিনি প্রেরণা যোগাতে থাকেন। রমেশ শীলের সহযোগী কবিয়াল রাইগোপাল দাসের সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় হয়। আর রমেশ শীলের পরিচয় হয়ে যায় বঙ্কিম সেনের সঙ্গে।[৩] এই সমস্ত পরিচয়ই ক্রমশঃ কমিউনিস্ট পার্টির গণ্ডির মধ্যে টেনে

নিয়ে গেল কবিয়ালদের অধিকাংশকে। মন্বন্তরের মধ্যেও বঙ্কিম সেনের নেতৃত্বে তাই নতুন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারল চট্টগ্রাম কবি সমিতি।

দেশ জ্বলে যায় দুর্ভিক্ষের আগুনে

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ জাপানী আক্রমণের মুখে পতন ঘটল সিঙ্গাপুরের। তারপর থেকে ক্রমশঃ ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে জাপানী আগ্রাসন। এক সময় তা এসে হাজির হল একেবারে চট্টগ্রামের দোরগোড়ায়। সারা দেশে ফুটে উঠল যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের একটি বিশেষ চেহারা। মুনাফাশিকারী, কালোবাজারী, কনট্রাকটার-ডিলারের দল যেমন একদিকে রাতা-রাতি হয়ে বসল রাশি রাশি টাকার পাহাড়ের মালিক, অন্যদিকে তেমনি গ্রামাঞ্চলের কোটি কোটি মানুষের মুখের সামান্য গ্রাসটুকুও পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকল চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই। নাভিশ্বাস উঠল শহরের মধ্যবিত্তের। আর স্রোতের মতন দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামগুলো থেকে শহরের রাস্তায়, ফুটপাথে ডাস্টবিনের আশেপাশে এসে জড়ো হতে থাকল কঙ্কালসার মানুষের অফুরন্ত মিছিল। 'সোনার দরে ধান বিকোয়, ধানের দরে জান বিকোয়—শহরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গাঁয়ের মানুষ! রাস্তায় রাস্তায় জমে ওঠে মরা মানুষের হাড় আর মাথার খুলি।'[১] যুদ্ধ প্রচেষ্টার আনুষঙ্গিক ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ইত্যাদি তৈরীর অষ্টপ্রহর হৈ-হট্টগোল, মিলিটারীর বুটের আওয়াজ ও সামরিক যানবাহনের সোরগোল—এই সবের মধ্যে একটু একটু করে পঞ্চাশের ভয়ঙ্কর মন্বন্তরের জালে জড়িয়ে পড়ল রমেশ শীলের চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিদিনের সরকারী রিপোর্ট থেকে জানা যায়: ১১ ১২ ৪২—'চালের দর হঠাৎ দ্বিগুণ হয়ে গেছে। শহরে সরবরাহের অবস্থা খুবই খারাপ।' ২৯. ৫. ৪৩—'চট্টগ্রামের অনেকে অনাহারে আছে চড়া দরের কারণে। প্রথম লংগরখানা খোলা হল।' ২৮. ৬ ৪৩—'শহরে দুঃস্থদের ভিড় বাড়ছে, শহরের রাস্তায় ১১জন মরেছে।' ১০ ৮. ৪৩—'চট্টগ্রাম শহরে বহু নিঃস্ব ব্যক্তি অসুস্থ ও অক্ষম হয়ে পড়েছে।' ৯. ৯. ৪৩—'চট্টগ্রাম শহরে আরো লোক মারা যাচ্ছে।'[২] রমেশ শীলের চোখের সামনেই এইভাবে তাঁর প্রিয় জন্মভূমি চট্টগ্রাম মাত্র কয়েক বছরের যুদ্ধের ঝাপটায়, জমিদার মহাজন মুনাফাখোরদের

১। চাটগাঁয়ের কবিওয়ালা, পূর্বোল্লিখিত।

২। কৃষকসভার ইতিহাস, পূর্বোল্লিখিত।

ভীষণ শোষণ ও লুণ্ঠনের দাপটে রূপান্তরিত হল এক বিশাল শ্মশানে। দেখা গেল, 'সে চট্টগ্রাম আর নাই। যে চট্টগ্রামে আগে অনন্ত সিংয়ের বীরত্ব কাহিনী মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করত, সেখানে চলছে চোর বদমায়েশের অবাধ রাজত্ব। ......যে চট্টগ্রামের মা-বোনেরা দেশভক্ত ছেলেদের মুক্তির জন্য একদিন শিবের মাথায় বেলপাতা দিত সেখানে আজ অসহায় মেয়ের দল, নিজেদের দেহ তুলে দিচ্ছে মিলিটারী আর কনট্রাকটরের হাতে...'।[১]

অন্যান্য বহু কবিয়াল ও লোকশিল্পীর মতন রমেশ শীলও ছিলেন ভূমিহীন। তাই যে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ চল্লিশ লক্ষাধিক দেশের মানুষকে ঠেলে দিয়েছিল মৃত্যুর মুখে, ছিন্ন ভিন্ন করেছিল সমাজের মূল্যবোধ, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, তা বলাই বাহুল্য, রেহাই দেয়নি এই লোককবিদের।[২] তবু অনাহারে, অর্ধাহারে, রোগশোকে বিপর্যস্ত হলেও, চতুর্দিকের ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যেও গান বন্ধ করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না রমেশ শীল ও তাঁর সহযোগী কবিয়ালদের পক্ষে। শ্রেণী-সচেতন কবিয়ালদের দল দুর্ভিক্ষের মোকাবিলায় জেলা কবি সমিতির পতাকার তলে এসে নতুনভাবে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন।[৩] মৃত্যুকে উপেক্ষা করেও তাঁরা এসে দাঁড়িয়েছিলেন নিরন্ন মানুষের পাশে। গান গেয়েছিলেন,

দেশ জ্বলে যায় দুর্ভিক্ষের আগুনে
এখনও লোক জাগিল না কেনে? (রমেশ শীল)

পরাণ কাঁদে যে দেশের লাগিয়া রে বন্ধু
পরাণ কাঁদে দেশের লাগিয়া

১। কল্পনা দত্ত। উদ্ধৃত, 'বাংলার বীর বন্দীরা', ১৯৪৫।

২। 'সেই মৃত্যু মিছিলে হারিয়ে গিয়েছে (কবি) সমিতির কোষাধ্যক্ষ'—'চট্টগ্রাম জেলা কবি সমিতি' প্রেরিত তথ্য।

৩। চট্টগ্রামের অন্যতম জননেতা বঙ্কিম সেনের যত্নে কবিসরকার রমেশ চন্দ্র শীলের নেতৃত্বে বাগোয়ান কৃষক সম্মেলনে চট্টগ্রামের প্রত্যেকটি কবিগায়ক ও যে কয়েকজন দোহার তখনও পর্যন্ত জীবিত ছিলেন তাঁরা সবাই উপস্থিত হয়ে সভাপতি রমেশ চন্দ্র শীল, সম্পাদক—ফণী বড়ুয়া, রাইগোপাল দাস প্রমুখ ৯জন কবিসরকারকে নিয়ে নূতনভাবে চট্টগ্রাম জেলা কবি সমিতি গঠন করেন। সেখানে তাঁরা হাজার হাজার কৃষকের সামনে প্রতিজ্ঞা করেন, 'চট্টগ্রামে লোকসঙ্গীত রক্ষা করব, হতাশ ও মুমূর্ষ চট্টগ্রামবাসীর প্রাণে আশা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলব।'...ঐ।

……মরিয়া যায় গরীব লোক
যার গুণে ধনীর সুখ
বাড়িল যে শোষণ করিয়া……
…দেখ পিপীলিকার পালে
এক যোগে রয় বিপদকালে
বন্যার জলে মরে না ডুবিয়া (ফণী বড়ুয়া) ;

এরূপ করে দেশের মানুষ কয়দিন বাঁচিবে
থর থর করে কাঁপে দেহ অন্নের অভাবে
……আসিয়া দস্যু জাপান
ভারত করিবে শ্মশান
জাগিলে হিন্দু মুসলমান বাঁচিব তবে (রাইগোপাল দাস)।

রমেশ শীলের তখনকার অসংখ্য গানে পাওয়া যায় মন্বন্তরের মুখে উজাড় গ্রামাঞ্চলের বিধ্বস্ত জীবনযাত্রার নিখুঁত ছবি :

দিন মজুরের ঘরজা যারা,
গত সনে মরেছে তারা
ঘরের ছানি দিব আজ কেমনে
মরে গিয়েও যারা আছে তারাও মরতে বসেছে
অনাহার আর রোগের পীড়নে।
দুই বেলা কেহ খায় না, কেহ কারো পানে চায় না
ভিক্ষা পায় না অন্ধ আতুরগণে
পুত্রকন্যা বেচে পিতা, ছেলের আহার খাচ্ছে মাতা
দয়া নাইকো কারো পরাণে
অন্ন-বস্ত্রে পেয়ে কষ্ট কত সতীদের সতীত্ব নষ্ট
দারুণ এই উদরের কারণে
এখনও লোক জাগিল না কেনে

দুর্ভিক্ষের ভয়ঙ্কর থাবার তলায় গ্রামের গৃহস্থবধূর পিষ্ট জীবনের মর্মস্পর্শী কাহিনী তিনি শুনিয়েছেন চট্টগ্রামের কথ্যভাষায় :

অসম বরিষার কালত ঘরগাঁন (ঘরখানি) আঁয়ার গেল পড়ি
কন্‌টকদারগ্যার ঘরত গেলাম কৈত্তাম তার খেছমত
দারুণ পেডর লাই আঁই ন চাইলুম ইজ্জত

মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষে একদিকে ফুলে ফেঁপে ওঠা কনট্রাকটর, ডিলার, কালোবাজারীর দল, ভীষণ মুদ্রাস্ফীতি আর অন্যদিকে লাখে লাখে মৃত্যু, ক্রমবর্ধমান দুর্দশার চোরাবালিতে ডুবন্ত সাধারণ মানুষ—তারই কথা ক্রোধ ও শ্লেষে মাখামাখি তীক্ষ্ণ ভাষায় রমেশ শীল বলেছেন একটি অসাধারণ গানে :

জ্বলে পুড়ে গেল দেশ, অত্যাচারের একশেষ
দেশবাসী হিন্দুমুসলিম ঘুমাইও না আর।
দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ি, পঁয়ত্রিশ লক্ষ গেল মরি
আবাল বৃদ্ধ মইল কত হাজারে হাজার···
মেয়ে মানুষ বেচাকেনা জীবনে যাহা শুনিনা
নোটের আশে হল দেশে এই এক অত্যাচার
কাগজ রে তুই কোথায় ছিলি নোট হয়ে দেশে আসিলি
তুই সে অঘটন ঘটালি তোরে নমস্কার।

কিন্তু শুধু শোষণের কথা বা দুঃখী মানুষের দুর্দশার ফিরিস্তিই শোনাননি রমেশ শীল। তার বিরুদ্ধে সর্বতোভাবে 'প্রতিরোধ'ও গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রকৃত শত্রু-মিত্র চিনে নিয়ে লড়াই-এর প্রান্তরে শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে বারবার উদ্বুদ্ধ করেছেন তিনি তাঁর গানে :

জেগে ওঠ জনগণ, থেকোনা আর অচেতন
উঠিয়া দাঁড়াও সবে নিজের কল্যাণে
দুর্ভিক্ষে মরিল যত সকল আমাদের মত
বড় লোকের মরণ নাই দেখিলে নয়নে
যদি আপন কল্যাণ চাও, চাষী মজুর জোট পাকাও
আবার দুর্ভিক্ষ আসে শুনি শ্রবণে
ধনতন্ত্র নাশ করি গণতন্ত্রের পথ ধরি
মিলে মিশে চেষ্টা কর বাঁচিব পরাণে।

সে সময় ব্রিটিশ যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে মদত দেবার প্রতিদানে শ্রমিক কৃষকের মধ্যে গণ-সংগঠন গড়ে তোলার একটা সুযোগ পেয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি। 'অনুকূল' পরি-

বেশে কৃষক সভার শাখা প্রশাখা তখন ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের আনাচে কানাচে। বাংলার অনেক জেলাতেই সে সময় 'কৃষক আন্দোলনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে সঙ্গীত, জননাট্য নাচ, গান প্রভৃতি কৃষ্টিমূলক কাজ'-ও দানা বাঁধছিল স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে। এইসব বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাকে সুসংগঠিত রূপ দেবার উদ্দেশ্যেই ১৯৪৩-এ জন্ম হয় নিখিল ভারত গণনাট্য সংঘের। যাইহোক কৃষক সমিতিকেই একমাত্র বাঁচার পথ হিসেবে চোখের সামনে দেখে রমেশ শীল লিখেছিলেন :

দেশের বন্ধু ভাই, দেশী লোকের প্রাণ রাখ বাঁচাই,
সংকটের উপর সংকট এবার বুঝি রক্ষা নাই
এই সংকট সমাধানে হিন্দু মুসলিম চাষীগণ
হালের গরু বীজধান পেতে জোরে কর আন্দোলন
কৃষক সমিতি গড়ে হিন্দু আর মুসলমানে।
ঐক্যের পথে এগিয়ে যাও এই সংকট সমাধানে,
জাতীয় সরকার স্থাপনে জাপানে দিব খেদাই।

পার্টির তৎকালীন 'জাপানকে রোখো' ও 'ব্রিটিশ যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে সাহায্য কর'—এই দুই নীতি সাধারণ মানুষের মনে কি পরিমাণ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিলো তা উপরের গানের শেষ দুটি লাইনে ফুটে উঠেছে চমৎকার। দেশের বুকের উপর চেপে বসে থাকা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে কোনরকম লড়াই নয়, ফ্যাসিস্ট জাপানকে তাড়াতে পারলেই যেন দেশের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত ও অবধারিত। স্বভাবতই গণনাট্য সংঘের প্রথম সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে সমস্ত 'স্বতঃস্ফূর্তভাবে [বলাই বাহুল্য পার্টি লাইনে !] গড়ে ওঠা গান আবৃত্তি ও নাচের আন্দোলনকে' স্বীকৃতি জানানো হয়েছিল এই কারণে যে তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নয় 'ফ্যাসিস্ট আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে ও মজুতদারদের বিরুদ্ধে এবং জাতীয় নেতাদের মুক্তি ও জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে জনগণকে এগিয়ে আসতে প্রণোদিত করেছে।' অবশ্য ঐ একই প্রস্তাবে কিছুটা ধোঁয়াটে ভাবে হলেও দু'টো ফ্রন্টের লড়াইকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল : 'জনগণের সামনে আশু সমস্যা হচ্ছে—বহিঃক্ষেত্রে, স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির জঘন্যতম শত্রু ফ্যাসিস্ট দস্যুদের আক্রমণ—এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে, বিদেশী সরকারের নির্যাতন, যারা জনগণকে চিরকাল বেঁধে রাখতে চায় এবং মাতৃভূমির কার্যকরী প্রতিরক্ষায় সংগঠিত হতে দিতে চায়

না।'[১] যদিও কার্যতঃ সমস্তটাই পর্যবসিত হয়েছিল ঐ 'প্রতিরক্ষা'মূলক কার্য-কলাপেই। তখনকার গণনাট্য আন্দোলনের মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উঠে আসা সংস্কৃতিকর্মীদের দু'একটি গানের আংশিক উদ্ধৃতিই ধারাটিকে স্পষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট হবে :

'এক হও রে ভাই হিন্দুমুসলিম এই ত উপায় বাঁচিবার
সোনার ভারত হইবে না ছারখার
জনরক্ষা কমিটি আজ গড়
জনরক্ষা বাহিনী আজ লড়
খাদ্য কমিটি আজ গড়
নিজের হাতে নেও দায়িত্ব অভাব দূর করবে
সরকারে চাপ দিয়া মাল আমদানী করবে
বন্ধ কর জুলুমবাজী অতিলোভী ফড়িয়ার।'

এমনকি চরকা কাটার গানও শোনা গিয়েছিল ধামাইল গানের সুরে :

'সুতা কাট চরকা চালাও চরকাই সম্বল
পতিত জমি আবাদ কইরা বাড়াইও ফসল লো!
গৃহস্থালীর খরচ পাতি কর সঙ্কোচন
ঘরে ঘরে কুটিরশিল্প কর প্রচলন লো!
জাপানীদের রুখতে মোদের এই তো হাতিয়ার
এই ভাবেতে করব আদায় জাতীয় সরকার লো!'

'মনে মনে শপথ মোরা করেছি দারুণ
দেশ রক্ষার তরে ফসল ফলাব দ্বিগুণ
ফসল বাড়াই আমরা জাপানী তাড়াই।' (হেমাঙ্গ বিশ্বাস)

এসব ছাড়াও ছিল অন্যান্য 'জনযুদ্ধের' গান ও কবিতা।

'এক হও ভারতের চল্লিশ কোটি সন্তান,
একতার কত জোর পাবে প্রমাণ,
ভাগবে দূরে শোষক জাপান—শোষক জাপান।'…(বিনয় রায়)।

'করো জাপানের আজ গতি রুদ্ধ,
শুরু করো প্রতিরোধ জনযুদ্ধ'।...

'আজ দৃঢ় দাঁতে পুঞ্জিত হাতে প্রতিরোধ করো শক্ত
প্রতি ঘাসে ঘাসে বিদ্যুৎ আসে জাগে সাড়া অব্যক্ত।'...(সুকান্ত ভট্টাচার্য)

রামপ্রসাদী সুরে গান :

'জাপানকে ভয় করবো না গো
ঘরের কাছে শত্রু এলো
ও দেশবাসী এবার জাগো
অস্ত্র তাদের কেড়ে নিয়ে মারবি তাদের তাহাই দিয়ে
স্বাধীন ভারত নিস ছিনিয়ে
বলিস রে 'জাপ দস্যু ভাগো' (প্রভাত বসু)

কৃষক-কবি নিবারণ পণ্ডিতেরও গান আছে :

'ধরি সরকারেরে, শক্ত করে, করি দৃঢ়পণ
জনগণের চাপে দাবি করিব পূরণ
...আজি এমনি ভাবে, আসুন সবে করুন আন্দোলন
কৃষক সভার পক্ষ হতে বলছে নিবারণ, এখন আওয়াজ তুল
এখন আওয়াজ তুল, ইনক্লাব বল, উড়ায়ে নিশান
জাতীয় গভর্ণমেণ্ট চাই রুখিতে জাপান।'

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে সে সময় চট্টগ্রামের বুকে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে 'চট্টগ্রাম রক্ষা কর' নামে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রদর্শনী সংক্রান্ত যাবতীয় নির্দেশই নাকি পাঠিয়েছিলেন পার্টির সাধারণ সম্পাদক যোশী। 'ফ্যাসিস্ট আক্রমণ প্রতিরোধ করে স্বাধীনতা অর্জনের' জন্য শিল্পীদের সামিল করার নির্দেশ ছিল তার মধ্যে একটি।[১] ফলাফলটুকু অনুমান করা কঠিন কিছু নয়। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জনসাধারণকে শত্রুর বিরুদ্ধে 'জনযুদ্ধে' সামিল করা নয়, 'কেবল মজুতদার ও কালোবাজারকে দায়ী করা হল...গানে-নাচে-নাটকে শুরু

হলো মড়া কান্না, ভুখা নাচ ও ক্ষুধার্ত জনের সেবার আহ্বান। শ্রেণীসংগ্রাম উবে গেল।[১]

১৯৪৩-এর চট্টগ্রাম জেলা কৃষক সম্মেলন হয়েছিল বাগোয়ানে। সেখানে কবিগানের বিষয় ছিল 'চাষী ও মজুতদার'। রমেশ শীল তাতে সম্মেলনের জয়গান গেয়েছিলেন,

আয়রে ত্বরা করে আয়রে কৃষক মজুর দল
ভাইয়ে ভাইয়ে সম্মেলনে বেড়ে যাবে বুকের বল
সারাদিন খেটে খেটে তবু অন্ন নাহি জুটে
মজুতদারে নিচ্ছে লুটে হচ্ছে মোদের ভিটা তল।

কিন্তু পি. সি. যোশীর নেতৃত্বাধীন পার্টির আত্মসমর্পণকারী লাইন কিভাবে সংগ্রামী মানুষের লড়াই-এর ধারটুকু পর্যন্ত ভোঁতা করে দিয়ে তাকে ক্লীবতার পথে ঠেলে দিচ্ছিল তার প্রমাণ রয়েছে ঐ গানেরই শেষ অংশে—

...যদি জমিদার দুঃখ বুঝিত
বাকী খাজনা মাপ করিত
কৃষকের আনন্দ হইত বাড়াইত দ্বিগুণ ফসল...।

বলা বাহুল্য, রমেশ শীলের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কোন দুর্বলতাপ্রসূত বিচ্যুতির প্রকাশ নয় গানটি। এই ক্লীবতা যেহেতু পার্টির গৃহীত রাজনৈতিক লাইনেরই পরিণাম, তাই গণনাট্য আন্দোলনের এগিয়ে থাকা কর্মীরাও রেহাই পাননি তার হাত থেকে। তাঁরাও 'ফসল বাড়ানো'র গানে জমিদার মহাজনের কাছে আবেদন নিবেদন করে গেয়েছেন:

'শোন রে দেশের মহাজন ধনী জমিদার
জন্মভূমি ভারতভূমি যায় রে ছারখার।
বন্ধ রাখ খাজনা ঋণের জুলুম অত্যাচার
চাষ আবাদের সুবিধা দাও দেশেরই মঙ্গল।' (হেমাঙ্গ বিশ্বাস)

যাই হোক মজার কথা এই যে রমেশ শীলের ঐ গানটিরই উল্লেখ করে গণনাট্যকর্মী পূর্ণেন্দু দস্তিদার মশাই লিখেছেন: 'গানখানি সেই কৃষক সম্মেলনে তিনি যখন... গেয়েছিলেন তখন উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে আশা ও আনন্দের হিল্লোল বয়ে

১। সাংস্কৃতিক যুক্তফ্রন্টের স্বরূপ ও সমস্যা, পূর্বোল্লিখিত।

যায়।' অবশ্য খাজনা মকুব করার আবেদন নিবেদন যখন ব্যর্থ হল তখন এই 'আশা ও আনন্দের হিল্লোল'ও স্তব্ধ হতে সময় লাগেনি বেশী। নতুন উপলব্ধিতে পৌঁছুলেন রমেশ শীল। মোহমুক্তির কথা তিনি ঘোষণা করলেন দৃপ্তকণ্ঠে :

বাংলার কৃষক ভাইগণ, হওরে চেতন
জমিদারের হাতের মুঠায় কৃষকের জীবন
বন্যায় মারে, পোকায় কাটে, জমিদারে ভাগা লুটে
রেহাই চাইলে জলি উঠে আগুনের মতন
শোষণকারী জমিদার, জমিদার নয় 'যম-দুয়ার'
লাঙল যার জমি তার, কৃষকের এই পণ
হিন্দু-মুসলমানে মিলি এক সঙ্গে আওয়াজ তুলি
জমিদারী যাক চলি, বাঁ চবে জীবন (১৫. ৭. ৪৪)

এরকম বাঁধভাঙ্গার ঘটনা কিছু ঘটলেও রমেশ শীলদের সঠিক পূর্ণাঙ্গ বিকাশ যে পার্টির নির্ভুল নেতৃত্বের অভাবের জন্যই প্রধানতঃ বারংবার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল, কোন সন্দেহ নেই সে বিষয়ে। না হলে 'জমিদার নয় যম-দুয়ার'—এই আপসহীন ঘোষণা করার মাত্র এক বছরের মধ্যে, তা যত সাময়িক কালের জন্যই হোক, কেনইবা আবার 'মোদের দেশ স্বাধীন করা হল না, কপালের দুঃখ ঘুচিল না'- জাতীয় হতাশায় ডুবে যাবে রমেশ শীলের কণ্ঠ? অথচ আমরা জানি হৃদয়ের ঐশ্বর্যে, আন্তরিকতায় ও সংগ্রামী আত্মোৎসর্গে এই কবিয়ালদের সমকক্ষ খুঁজে পাওয়াটাই কঠিন। অতএব রমেশ শীলের গানের চূড়ান্ত বিচার করবার সময় (সুকান্ত ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রেই বা নয় কেন?)[১] এই সত্যটুকু আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে। অন্ততঃ রমেশ শীলকে 'অক্লান্ত, অভ্রান্ত সংগ্রামী'[২] বলার আগে মুহূর্তের জন্য হলেও রণেশ দাশগুপ্ত মশাইতো একবারটি থেমে পার্টির 'অভ্রান্ত'

১। সুকান্ত ভট্টাচার্য 'জনযুদ্ধে'র কবি। তাই তাঁর কবিতাতেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা সামগ্রিক ভাবেই প্রায় অনুপস্থিত। তাঁর সমস্ত বিক্ষোভ বিদ্রোহের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য : জোতদার—মজুতদার ('শোনরে মালিক শোনরে মজুতদার') এবং ফ্যাসিস্ট জাপান ও জার্মানী। তাঁর কবিতাতেও গান্ধী প্রশস্তি : রক্তে বেজেছে উৎসব, আজ হাত ধর গান্ধীজী। সুকান্তর প্রকৃত মূল্যায়নের মুহূর্তে এই পরিপ্রেক্ষিতটুকু স্মরণে রাখা কর্তব্য।

২। ভূমিকা, লোকগীতি—রমেশ শীলের শ্রেষ্ঠ গান ও ছড়ার সংকলন। চট্টগ্রাম, ১৯৬৪।

লাইন স্মরণ করতে পারতেন ! তাতে আবেগের মাত্রা একটু কমলেও হয়ত কবির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটত আরও একটু বেশী !

হিন্দু না ওরা মুসলীম

চল্লিশের দশকে অনুসৃত 'জনযুদ্ধের' লাইন কমিউনিস্ট পার্টিকে যে সমস্ত স্ববিরোধী, অভিনব এবং চূড়ান্ত বিচারে বিপজ্জনক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল—পার্টি নেতৃত্বের পার্টিশান সংক্রান্ত রোমহর্ষক কার্যকলাপ ও বক্তব্য ছিল তারই মধ্যে একটি।

১৯৪০-পূর্বকাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির মতে ভারতবর্ষ ছিল এক জাতির দেশ।[১] কিন্তু ৪২-এর পর থেকেই মূলতঃ তার বক্তব্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এবং সঠিকভাবেই পার্টি ভারতবর্ষের বহুজাতিসত্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়। তবে গলদটা থেকে গেল একেবারে গোড়াতেই। কারণ তখন ব্রিটিশ যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে পরিপূর্ণভাবে মদত দেওয়া ও তার পিছনে সমস্ত রাজনৈতিক দলের সমর্থন সংগ্রহ করাই ছিল পার্টির একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই একদিকে কংগ্রেসের অগাস্ট আন্দোলনকে সমর্থন না করলেও তার বন্দী নেতাদের মুক্তির জন্য যেমন পার্টির নেতারা জনমত গঠনের ডাক দিয়েছিলেন অন্যদিকে তেমন তাঁরা মুসলীম লীগের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিও প্রকাশ করেছিলেন সহানুভূতি। যোশী ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের সাম্প্রদায়িক ভিত্তি স্বীকার ক'রে নিয়ে লীগকে 'দেশের দ্বিতীয় বৃহৎ সম্প্রদায়ের প্রধান রাজনৈতিক সংগঠন' হিসাবে চিহ্নিত করলেন। লীগ-কংগ্রেস ঐক্য মানেই জাতীয় ঐক্য—এই বিবেচনা থেকে তিনি তার জন্য দাবীও জানালেন। স্বভাবতই যুদ্ধপ্রচেষ্টার প্রতি জাতীয় নেতাদের সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে চার্চিল সরকারের তরফ থেকে যখন আপস মীমাংসার কিছু প্রস্তাব নিয়ে ক্রীপস মিশন ভারতে এল তখন কমিউনিস্ট পার্টি কালবিলম্ব করল না প্রস্তাবিত বোঝাপড়ার প্রতি পরিপূর্ণ সম্মতি জানাতে। তবুও লীগ বা কংগ্রেস কোন দলেরই মন জোগাতে না পারায় ক্রীপসের দৌত্য ব্যর্থ হয়ে যায়। তারপর থেকে যত দিন যেতে লাগল পার্টি মুসলীম লীগ ও লীগের পার্টিশান সংক্রান্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে সমর্থনসূচক বক্তব্য রাখতে থাকল ততই খোলাখুলি ভাবে। সাজ্জাদ জহীর (তখন প্রগতি লেখক সংঘের সেক্রেটারী)

১। Communism In India, P 232

তো তাঁর এক ভাষণে লীগের 'সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, মুক্তি সংগ্রামী ভূমিকা'র উল্লেখই শুধু নয়, তার 'আত্মনিয়ন্ত্রণ অথবা পাকিস্তানের দাবী'কে পর্যন্ত 'ন্যায়সঙ্গত প্রগতিশীল এবং জাতীয় দাবী' বলে হাজির করলেন।[১] কমিউনিস্ট পার্টির সুবিধাবাদী নেতৃত্ব এই ভাবে 'জনযুদ্ধ'কে সফল করবার অদম্য আগ্রহে 'জাতিসত্তা'র তত্ত্বটিকে ধর্মের ভিত্তির উপর (ডঃ গঙ্গাধর অধিকারীর মস্তিষ্ক-প্রসূত তত্ত্ব) দাঁড় করিয়ে ফেলতেও দ্বিধা করল না।

সুতরাং পার্টির এই রাজনৈতিক উপলাইন যে তৎকালীন গণনাট্য আন্দোলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রাখবে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। আবদুল্লাহ রসুল 'কৃষক সভার ইতিহাসে' লিখেছেন, 'কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির জন্য কৃষক সভা বরাবর নিয়মিত প্রচার ও আন্দোলন করেছিল এবং কংগ্রেসের ও লীগের মিলিতভাবে দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্যও জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল। সভা ১৯৪৩ থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মারফত এই প্রচারকে বিশেষভাবে কৃষকদের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল' (পৃঃ ১৪৬)। স্বভাবতঃই পার্টির নির্দেশে গণনাট্য সংঘের শিল্পীরা তাঁদের সমস্ত শক্তিকেই নিয়োজিত করেছিলেন এই প্রচারে ঃ

'দেশে সবে মাত্র, কৃষক ছাত্র, একত্র হইয়া
লীগ কংগ্রেস ঐক্য ভাব তুলছিলো গড়িয়া। দস্যু রুখবার তরে
দস্যু রুখবার তরে, ঘরে ঘরে, কৃষক সন্তান
ঐক্যবদ্ধ হইতেছিল রুখিতে জাপান'···

'লীগ-কংগ্রেস-সেবী বাংলার
কোথায় স্বরাজ সাধনা তোমার
দেশ যদি আজ যায় ছারখার
কে লড়িবে রণ স্বাধীনতার ?'

'আজো জেলে রইয়াছেন বন্দী
আজাদ, জহরলাল, গান্ধী
এক হইয়া তাদের মুক্তি করিব আদায় গো।

১। Ibid, P 215

আজো ভারত রইলো পরাধীন
এবার মোরা হইব স্বাধীন
কংগ্রেস লীগ এক হইলে জাপানী পালায় লো।'

কিংবা 'বাঁচবি যদি ত্বরা করে আয়—কে আছ কোথায়,
এ ভারতের কমিউনিস্ট দল ডাক দিয়ে যায়—কিরে হৈ হৈ হৈয়া
কংগ্রেস লীগ এক হইলে সেই তরণী বায়।'

সর্বোপরি ছিল দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক গান,

'দেশের ভাব দেখিয়া মরি !
ভাবের অভাব হইল দেশে
ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ করি
ভাব দেখিয়া মরি
...শুন কংগ্রেস নেতাগণ
মুসলমানের আত্মশাসন
না মানিলে হয় না মিলন
দেখো চিন্তা করি।'

রমেশ শীলের অসংখ্য গানেও তাই শোনা গিয়েছিল এই সবেরই প্রতিধ্বনি। যেমন—

...জিন্না সাহেব মহাত্মাজী
হয়েছেন আজ সেনাপতি
আলাওল, রবি, রামমোহন
যতীন্দ্র চিত্তরঞ্জন
অলক্ষ্যে করতেছেন স্থিতি
...চেষ্টা করলে ছাত্র সবে
লীগ কংগ্রেস ঐক্য হবে
জাতীয় সরকার আসিবে
বাঁচিবে বাঙ্গালী জাতি।

অথবা ...লীগ কংগ্রেস এক করতে
সে যন্ত্র ছাত্রদের হাতে
আমলাতন্ত্র সে জন্যেতে শিক্ষার দিকে দৃষ্টি না করে।

অনাগত পাকিস্তানের জয়ধ্বনিও শোনা গিয়েছিল তাঁর একটি গানে,

উড়াও লীগের পতাকা যত মুসলমান
আল্লাহু আকবর আসবে স্বাধীন পাকিস্তান
...পতিত জমি আবাদ করে, ফসল বাড়াও জোরে
জব্দ কর মজুতদারে দেশনাশা শয়তান,
সবাই মিলে আজ কায়েম কর পাকিস্তান।

পূর্ণেন্দু দস্তিদার মশাই এই গানেরই সমর্থনে লিখেছেন 'তাঁর গানের প্রধান শ্রোতা চট্টগ্রামের চাষী, মজুর, মেহনতী মুসলমান; তাই মুসলমানের এই প্রাণের দাবীর প্রতি এই বিশিষ্ট লোক-কবির শ্রদ্ধাপূর্ণ সমর্থন ছিল।' বাস্তবপক্ষে অন্ততঃ একটি অধ্যায়ে যে দেশ বিভাগের দাবীকে কমিউনিস্ট পার্টি মুসলীম সম্প্রদায়ের 'প্রাণের দাবী' মনে করত সে কথা অনস্বীকার্য। তবে অল্প কিছুকালের মধ্যেই কমিউনিস্ট পার্টির উদারহৃদয় নেতৃত্বকে সরাসরি উল্টো পথে, উল্টো মতে বিচরণ করতেও দ্বিধাগ্রস্ত দেখা গেলনা বিন্দুমাত্র। যে রজনী পাম দত্তর 'ব্রিটিশ যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে সাহায্য' করার লাইনের তদ্বিরে এক সময় সুফল ফলেছিল হাতে হাতেই, তিনিই এবার যখন প্রস্তাবিত পাকিস্তানের বিরোধিতা করে নতুন কৌশলে কংগ্রেসকে শান্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথা বোঝাতে থাকলেন ভারতীয় কমিউনিস্ট নেতাদের, তখন আর একবার প্রমাণিত হল তাঁর হাতযশ। অবিভক্তভাবে একটি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত থাকলেই ভারতীয় জনতার সব চাইতে বেশী মঙ্গল সাধিত হবে—এ বিষয়ে সি পি আই তার দৃঢ় বিশ্বাস ঘোষণা করল ক্যাবিনেট মিশনের কাছে দেওয়া মেমোরাণ্ডামে। সন্তুষ্ট রজনী পাম দত্ত নেতাদের তখন মাভৈঃ বাণী শুনিয়ে বললেন, এক সময় কমিউনিস্ট পার্টি লীগের পার্টিশান-সংক্রান্ত দাবী সমর্থন করেছিল—এ জাতীয় কাহিনীকে এই বিবৃতি শুধু যে মারল তাই নয়, সেটা মরে একেবারে কাঠ হয়ে গেল (পৃঃ ২৪০, ওভারষ্ট্রীট ও উইণ্ডমিলার)। অর্থাৎ, দত্ত সাহেব বলতে চাইলেন, এই রোমহর্ষক ইতিহাসটুকু ধামাচাপা পড়ে গেল চিরকালের জন্যই। কিন্তু তাতো নয়ই, বরং এই সান্ত্বনাদানের ঘটনাটিই অতিরিক্ত রোমহর্ষ ঘটাবার ক্ষমতা নিয়ে টি*কে থাকল ইতিহাসের পাতায়।

'জনযুদ্ধে'র পর

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেশের পরিস্থিতি বিদেশী শাসক এবং কি দক্ষিণ কি বাম উভয় নেতৃত্বের পক্ষেই হয়ে উঠতে থাকল ক্রমাগত বিপজ্জনক। অসহিষ্ণু হয়ে উঠল দেশের মানুষ। যুদ্ধতো শেষ হল, কিন্তু কোথায় গেল প্রতিশ্রুত স্বাধীনতা! সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভারতীয় জনতার বিক্ষোভ এবার নেতাদের নিষেধের প্রাচীর ডিঙ্গিয়েও ফেটে পড়তে লাগল চতুর্দিকে। লাল কেল্লায় বন্দী আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর মুক্তির দাবীতে ১৯৪৫-এর নভেম্বরে আই. এন. এ দিবসে উত্তাল হয়ে উঠল কলকাতা। রাজাবাজার বস্তিতে শহীদ হলো কদম রসুল, শহীদ হলো রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। জনতার ধৈর্যের বাঁধ আবার ভেঙে পড়ল ফেব্রুয়ারী '৪৬ রশীদ আলী দিবসে। তারপর বোম্বাই-এর বুকে ব্যাপক জনসাধারণের ও স্থানীয় কমিউনিস্ট কর্মীদের সমর্থনপুষ্ট রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভির ঐতিহাসিক সশস্ত্র বিদ্রোহ কাঁপিয়ে দিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত। বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণের সময় তাঁদের 'ম্যানিফেস্টো'তে বলেছিলেন, 'এই প্রথম সমর বিভাগের ভারতীয় কর্মী এবং ভারতীয় জনগণের রক্ত এক লক্ষ্যে এক খাতে মিশলো—আমরা একথা কখনো ভুলবোনা, এবং আমরা জানি আমাদের অসামরিক সাথী ভাইবোনরাও ভুলবেনা'। ভোলেননি রমেশ শীল এবং দেশের মানুষকেও ভুলে থাকতে দিতে চাননি এই সব ঘটনা। প্রকৃত গণকবিয়ালের দায়িত্ববোধ থেকেই পরবর্তীকালে সংগ্রামী অতীতকে তিনি বারবার বর্তমানের সামনে আনতে চেয়েছেন শিক্ষা হিসাবে :

মুছে নাইতো প্রাণের দাগ, পাঞ্জাব জালিয়ানওয়ালাবাগ
ভুলেছ কি তুরস্কের খেলাফত আন্দোলন
ভুলেছ কি আছে মনে বোম্বে নৌবিদ্রোহীগণে
ভুলেছ কি আজাদ হিন্দ ফৌজ মুক্তি বিবরণ
…দেখতে দেখতে ভুলে গেলে, সেই দিন ত রক্ত দিলে
ছাত্র জনতা কেপটেন রশীদ আলী মুক্ত করিবার কারণ
ভুলেছ কি সেই কথাটি, ছাত্র রক্তে ভিজে মাটি,
কদম রসুল রামেশ্বরের যেদিন শাহাদত বরণ।

নৌ-বিদ্রোহ সম্পর্কে আবদুল্লাহ রসুল লিখেছেন, 'এমনকি কংগ্রেস ও লীগের নেতৃত্বকে পর্যন্ত হতভম্ব ও আতঙ্কিত করে তুলেছিল' এই বিদ্রোহ। এখানে এই

'এমন কি' দিয়ে রসুল সাহেব কি এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে, কমিউনিস্ট পার্টিকে তো বটেই তা 'এমন কি' লীগ ও কংগ্রেস নেতাদেরও ঘুম কেড়ে নিয়েছিল! না হলে আমরা তো জানি লড়াই শুরু হবার পর প্রবল সরকারী প্রতিহিংসার মুখে নৌ-বিদ্রোহীদের প্রতিনিধিরা কমিউনিস্ট পার্টির সদর দপ্তরে গিয়ে যখন তাঁদের লড়াই-এ পার্টির নেতৃত্ব প্রার্থনা করেছিলেন তখন নপুংসক নেতৃত্ব দেখিয়ে দিয়েছিল লীগ কংগ্রেসের অফিসের দরজা। কারণ তখন তো ইংরেজের সঙ্গে আপস মীমাংসা, গদি ভাগাভাগি প্রায় শেষ হয়েই এসেছে, পুরোদমে চলছে ওয়াভেলের দৌত্য। ভালয় ভালয় সাহেবরা এখন বাড়ী যাবে, অর্থাৎ কিনা 'কুইট ইণ্ডিয়া', তা না যাবার মুখে এ কি বিপত্তি! তাই কংগ্রেসী নেতারা (নেহেরু, প্যাটেল) বললেন 'অসহ্য' 'আত্মসমর্পণ কর', কমিউনিস্ট নেতারা বললেন, আমরা কিছু জানি না। তবে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে পার্টি নেতৃত্বের সুবিধাবাদী লাইন গণনাট্য আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে সব সময় গ্রাস ক'রে ফেলতে পারেনি, কারণ পার্টির মধ্যে যেমন, সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও তেমনি সব সময়ই থেকেছে দুই লাইনের লড়াই। তাই সেই সময় নাবিক বিদ্রোহও হয়ে উঠতে পেরেছিল গণ-সঙ্গীতের, গণনৃত্যের বিষয়বস্তু। যাই হোক এরপর '৪৬-৪৭ এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেল তেলেঙ্গানার লড়াই, তেভাগা আন্দোলন। তেলেঙ্গানায় প্রথম সশস্ত্র লড়াই শুরু হয় ১৯৪৬-এর জুন মাসে। আর ১৯৪৭ শেষ হবার আগেই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল প্রায় ৩০০ গ্রামে। অন্যদিকে তেভাগা যদিও ছিল মূলতঃ অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার আন্দোলন, তবুও বহুক্ষেত্রেই রাষ্ট্র-শক্তির মোকাবিলায় সশস্ত্র লড়াই-এ নামতে হয়েছে কৃষকদের। তবে একথা বলাই বাহুল্য যে তাতে বাধা দিতে পার্টির সুবিধাবাদী নেতৃত্বের তরফ থেকে চেষ্টার কোনরকম অভাব ছিল না। যাইহোক চট্টগ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছিল এই তেভাগা আন্দোলন। বিশেষ করে রমেশ শীলের বোয়ালখালী এবং পাটিয়া থানায় তো তা রীতিমতন তীব্র হয়ে ওঠে। রমেশ শীলের সহযোগী রাইগোপাল দাসের মতন কবিয়ালদের অনেকেই দূর থেকে গা বাঁচিয়ে দেখেননি আন্দোলন, তার সঙ্গে নিজেদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁরা যুক্ত করেছিলেন।[১] এই আন্দোলনের জোয়ার যে অন্যান্যদের মতন রমেশ শীলকেও উদ্দীপ্ত করে তুলবে সে কথা বলাই বাহুল্য।

১। চট্টগ্রামের কবিগানের ইতিহাস, পূর্বোল্লিখিত।

মাত্র এক বছর আগে কমিউনিস্ট পার্টির বন্ধ্যা রাজনীতিতে ক্লিষ্ট রমেশ শীলের হতাশ কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল,

মোদের দেশ স্বাধীন করা হল না
কপালের দুঃখ ঘুচিল না। (১৫. ৮. ৪৫)

তেভাগা আন্দোলনের ঢেউ তাঁর সংগ্রামী চেতনা আবার জাগিয়ে দিল :

ওঠ জাগো জাগো কৃষক ভাই থেকোনা ঘুমে
বীর সন্তান যত আছ তোমরা ভারতভূমে
পরাধীনা পরাশ্রিতা জননী আমার
তোল রক্ত পতাকা সকলে করিয়া হুংকার
ধ্বংস করো যত শোষণ জুলুমে···। (১০. ১০. ৪৬)

চট্টগ্রামের কথ্য ভাষায় রমেশ শীল কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিলেন আশার খবর, লড়াই-এর খবর :

তোঁয়ারা (তোমরা) হুন্‌নি ভাই হুন্‌নি (শুনেছ কি)
খোশ খবর খান হুন্‌নি
জইনর (জমির) মালিক চাষা হইব খবর পাইয়নি (পেয়েছ কি)
······শোন যত চাষী ভাই, লাঙ্গল যার জইন তার,
আর কন (কোন) কথা নাই
জান দিয়ম্ (দেব) জইন না ছারগ্যাম (ছাড়ব না)
কইরলে করুক কোরবানী।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষের এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্যে ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের পূর্বাভাষটুকু নির্ভুলভাবে পাঠ করে নিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিলম্ব করেনি। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী নেতারা বুঝল যে এই মুহূর্তে ক্ষিপ্ত দেশবাসীকে একটা কিছু কার্যকরী ধোঁকা দিতে না পারলে রাষ্ট্রযন্ত্রে ভাগ বসাবার স্বপ্নতো বটেই, নিজেদের সাধের প্রাণটাও ফেঁসে যাবার সম্ভাবনা প্রচুর। তাই আন্তরিক তাগিদ থেকে ব্রিটিশ-রাজসহ সবাই তড়িঘড়ি লেগে গেল নিজেদের মধ্যে একটা বোঝা-পড়ায় পৌঁছুতে। ইলেকশান, ইলেকশান—প্রচারে ম'ম'-করতে লাগল দেশের বাতাস। সব দলের নেতারাই তদ্গত থাকলো নিজেদের আসন ভাগ বাঁটোয়ারা ও ভবিষ্যৎ ভাবনা নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি নিজেদের তৃতীয় বৃহত্তম

পার্টি বলে দাবী করে ধুয়ো তুললো 'কংগ্রেস-লীগ-কমিউনিস্ট এক হও।'[১] তেলেঙ্গানা, তেভাগা আন্দোলন বা হাজং থেকে সমস্ত সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের মুখ ফেরানো হল ইলেকশানের দিকে। নেতাদের নির্দেশে ভোটের গান গাইতে হল রমেশ শীল, ফণী বড়ুয়া, রাইগোপাল দাসদের :

'......যদি সুখে খাইবার আশা কর, কমিউনিস্ট তলাশ কর
তারা বিনা সাচ্চা মানুষ নাই',
'বাঘেরে ঘায়েল করিবে, হরিণের শান্তি মিলিবে
সেই দলকে চিনে ভোট দিবে
না হয় ঠকবে আজীবন' ইত্যাদি।

এইভাবে ভারতবাসীর প্রকৃত মুক্তি-সংগ্রামকে বানচাল করার জন্য দেশ বিভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়ঙ্কর চক্রান্ত সমস্ত আকাশে যখন ক্রমশঃ ঘন হয়ে উঠছে তখনও কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা নির্বাচনী লড়াই-এর অতিরিক্ত কোনরকম সংগ্রামী কর্মসূচী গ্রহণ করল না। উচ্চারণ করল না কোন সতর্কবাণী। উপরন্তু সংকটের পরিত্রাণের জন্য গান্ধী ও জিন্নার উপর তাদের দাসসুলভ নির্ভরতা পরিস্থিতির শোচনীয়তা বৃদ্ধি করল আরো বহুগুণ। ফলে বাধলো '৪৬-এর দাঙ্গা। রমেশ শীলের গানের ভাষায় :

দেশ দিল ভাই ছারেখারে।
জ্বলে দিবা রাত্রি দুঃখের বাত্তি বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে॥
সাইমন ক্রীপস কুপল্যাণ্ড গেল শেষে মন্ত্রী মিশন এল।
বিভেদের বিষ ঢুকাইল বাঙ্গালীর শরীরে॥
সেই বিষে উন্মাদ হয়ে মারামারি করে।
রক্তগঙ্গা বহাইয়া ভাইরে ধরি ভাই সংহারে।

কলকাতা শহরে চারদিনেই মারা গেল চার হাজারের উপর মানুষ। আহত হল আরো পনেরো হাজারের মতন। এই ঘটনার কিছুকাল আগে কলকাতায় এসেছিলেন রমেশ শীল। এবং প্রত্যক্ষভাবে গানের মধ্য দিয়ে পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন এ বাংলার মানুষের সঙ্গে। অবশ্য আরও আগে ১৯৪৫ এর মার্চে বর্ধমান জেলার হাটগোবিন্দপুরে কৃষক সভার প্রাদেশিক সম্মেলনের অষ্টম

১। নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিপ্লবের সন্ধানে, পৃঃ-৩৩৮।

অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন তিনি।[১] কলকাতায়ও এসেছিলেন ফণী বড়ুয়া ও রাইগোপাল দাসকে সঙ্গে নিয়ে, মোহম্মদ আলী পার্কে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে কবিগানে অংশ নিতে। সেই অনুষ্ঠানে কবির লড়াইয়ে তাঁর বিপক্ষে ছিলেন পশ্চিম বাংলার বিখ্যাত কবিয়াল গোমানি দেওয়ান এবং গোমানি-শিষ্য লম্বোদর চক্রবর্তী।[২] এরই কিছুকাল পরে যখন বেধে গেল দাঙ্গা তখন দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলকাতায় কবিগানের মধ্য দিয়ে মানুষের মনে সাহস সঞ্চার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বোধ জাগিয়ে তোলার ভার পড়ল রমেশ শীল ও শেখ গোমানির উপর। তাঁরা দুজনই নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছিলেন নিষ্ঠার সঙ্গে।

রমেশ শীলের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে তিনি আজীবন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গান গেয়েছেন, নিছক কোন বিমূর্ত মানবতাবাদী ভাবাদর্শ থেকে নয়, সরাসরি শ্রেণীসচেতনতা থেকেই। তিনি গেয়েছেন—

হিন্দু-মুসলিম মারামারি দেশে এল কি ঘটনা
যত কুলী মজুর গরীব মরে, নেতারা ত কেউ মরে না।

---

[১] [illegible] ইতিহাস, পৃ ১৩৭

[২] 'All awaited the appearance of the famous bards billed for the evening—Ramesh Seal, nature's own patriotic poet from Chittagong with an able lieutenant in Phani Barooa on the one side, and Shaikh Gomhani, champion bard of West Bengal with his lieutenant the voluble Lambodar on the other···When Ramesh Seal portrayed the devastation that imperialist exploitation has brought upon our land and sang of national unity, it was obvious that any day Ramesh could beat most speakers hollow.—Hiren Mukherjee, People's War, April 1, 1945 (Anti-Fascist traditions in Bengal, Indo-GDR Friendship Society, 1969)

শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি উচ্চারণ করলেন সতর্কবাণী

হুশিয়ার খুব হুশিয়ার, হুশিয়ার খুব হুশিয়ার—হুশিয়ার
বিভেদকারী কাছে আসি বন্ধুর ভাব দেখায়
...আছে যত শ্রমিক ভাই, শ্রমিকের দরদী শ্রমিক, আর কেহ নাই,
বিভেদ মন্ত্র কানে ঢুকাই, উস্কানি দেয় বারংবার
...দেশবাসী হিন্দু-মুসলমান, এই দুশমন হইতে সবে থেকো সাবধান,
তারা সুযোগ পাইলে তলে তলে বসাইবে দাংগার বাজার।
...ভুল বুঝে মূল হারাইও না শুন বন্ধুগণ
আবার ভুল করিলে, হবে সর্বনাশ সাধন
হিন্দু-মুসলিম দুই ভাই কেহ ছাড়া কেহ নাই
বিভেদকারী ঘটায় দেশে যত অঘটন।

এই একই চেতনা থেকে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানে বসবাসকারী কবি নিজের মৃত্যুদিন পর্যন্ত তাঁর গানে স্বরূপ উন্মোচন করে গিয়েছেন সাম্প্রদায়িকতার ও তার শ্রেণী-উৎসের।

সাদা চামড়া চলে গেছে, এখনও তার দালাল আছে,
বুঝতে বাকি নাই কিছু আর
সূক্ষ্ম ভাবে দৃষ্টি দিলে জমা খরচ যাবে মিলে,
দাংগার তলে গোপন হস্ত কার।

রমেশ শীল জানেন যে সাম্প্রদায়িকতা প্রতিক্রিয়ার হাতে একটা প্রয়োজনীয় অস্ত্র এবং কেন প্রয়োজনীয় সে কথাও তাঁর কাছে স্পষ্ট:

যত কায়েমী স্বার্থের দল হয়ে উঠেছে প্রবল
নিজ স্বার্থ হাসিল করিবারে
চোরকে বলে চুরি করিস গৃহীকে কয় সজাগ থাকিস
বিভেদ মন্ত্র কানে কানে ছাড়ে
গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার হয় যখন
তখন তারা দাংগা উসকায়
বিভেদের নীতি নিয়া ধর্মীয় অন্ধতা দিয়া স্থানে স্থানে অঘটন ঘটায়।

'সাদা চামড়া চলে গেছে'……

যাই হোক ভাগ হল ভারতবর্ষ। শোষণের অখণ্ড অধিকার লাভের প্রত্যাশা নেতাদের ছিল দীর্ঘকালের। কিন্তু যখন মাউন্টবেটনী মীমাংসা মেনে না নিয়ে আর উপায় থাকলনা তখন স্বাধীনতার ঢক্কা নিনাদ তুলে সময় থাকতে থাকতেই শোষণের ক্ষমতা ও অঞ্চল নিজেদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে নেওয়াটাই হয়ে দাঁড়াল বুদ্ধিমানের কাজ। ১৯৪৭-এর ১৪ই ও ১৫ই অগাস্ট পাকিস্তান ও ভারত 'স্বাধীন' হল। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি উপর উপর মাউন্টবেটন প্রস্তাবের কিছু সমালোচনা ক'রে ঠাট বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল। তবে তাকে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত আখ্যা দেবার সঙ্গে সঙ্গে পার্টি একথাও বলে যে 'সব দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও পরিকল্পনাটি ভারতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট পদক্ষেপ। এই বিবেচনা অনুসারে তাঁরা নেহরু সরকারকে তাঁদের সমর্থন জ্ঞাপনের সিদ্ধান্ত নেন।'[১] পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এক প্রস্তাবে '……সগর্বে জাতীয় নেতৃত্বের সাথে পুরোপুরি সহযোগিতা' করবার কথাও ঘোষণা করে। স্বভাবতই পার্টির নেতারা ১৫ই অগাস্টকে 'জাতীয় উৎসবে'র দিন হিসাবে পালন করবার নির্দেশ জারী করলেন। যোশীর মতে '…১৫ই অগাস্ট আমাদের দেশের জনগণের সম্মুখে এক নতুন স্বাধীন জীবনের সম্ভাবনা খুলে দিয়েছে।'[২] জাতীয় সরকারকে সক্রিয় এবং সর্বাত্মক সমর্থন জানাবার ধ্বনি তুলে পার্টির নেতারা তাঁদের প্রাক্-'৪৭ সমস্ত কর্মসূচী বাতিল তো করলেনই, প্রত্যাহার করে নিলেন তেভাগা আন্দোলন। ভবানী সেন আবেদন জানালেন: 'গত বছরের মতো এ বছর তাঁরা যেন কোন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে না যান……আইনের মাধ্যমে (কংগ্রেস ও লীগের নতুন সরকারকে) তার প্রতিশ্রুতি পালনের একটা সুযোগ দেওয়া দরকার।'[২] সুতরাং কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা বুঝলনা বা বুঝতে চাইলনা ক্ষমতা হস্তান্তরের রহস্য বা নয়া-ঔপনিবেশিক চক্রান্তটুকু। বরং পার্টির নেতারা জনগণবিরোধী ষড়যন্ত্রেই মদত দিয়ে বসল, প্রতিবিপ্লবকেই লালন করতে থাকল নিজেদের কার্যকলাপ দিয়ে।

১। পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২৮৮।

২। বদরুদ্দীন উমর: পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, প্রথম খণ্ড পৃঃ ২৯০, উদ্ধৃতি।

দেশ ভাগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই কমিউনিস্ট পার্টিও হ'ল দু'টুকরো। রমেশ শীল দেশত্যাগী হলেন না। থেকে গেলেন তাঁর আজন্ম-পরিচিত মানুষগুলোর মধ্যে, জন্মভূমিতে। তাঁর মতে, সুখ দুঃখ ছাড়া কোন দেশ নেই আর বাঁচবার জন্য লড়াইতো মানুষকে করতে হবে সর্বত্র :

সুখ দুখ ছাড়া ত দেশ নাই, হক্কল দেশত করন পরে বাঁচিবার লড়াই
দেশত্যা ভাইবন্ধু ফেলাই কি ল্যাই রিপুজি হইতাম।

এই স্পষ্ট যুক্তিতেই তিনি চট্টগ্রামের ভাইবন্ধুদের ফেলে রিফিউজি হয়ে আর ভারতে এসে পড়লেন না। স্বাগত জানালেন পাকিস্তানের আবির্ভাবকে। তার কারণটা বোঝাও কঠিন নয়। পাক-ভারত উপ-মহাদেশের সমস্যার চরিত্র এক হওয়ার জন্যই প্রধানতঃ পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির উত্তর '৪৭-এর সমস্ত কর্মসূচী কার্যতঃ ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক লাইনের প্রতিফলন। রমেশ শীল স্বভাবতঃই তাই পাকিস্তানের জন্ম হওয়ায় আশান্বিত হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন এর মধ্য দিয়েই হয়ত রূপায়িত হতে চলেছে তাঁর এতদিনের স্বপ্ন। গান বেঁধেছিলেন

এগিয়ে চল্ এগিয়ে চল্
বাজে বিজয় ভেরী গগন বিদারি কিসের শঙ্কা কিসের ভয়
মুক্ত কণ্ঠে গাহিব মোরা জয় পাকিস্তানের জয়···।

আর একটা গানে :

······পাকিস্তানের আর কি ভয় পাট চা ধান হয়
সুতা জন্মে পাহাড়ময় মিলিবে বসন রে
পতিত জমি আবাদ হলে অন্নকষ্ট যাবে চলে
হিন্দু মুসলিম মিলে কর আয়োজনরে।
বন্ধুগণ কায়েম হল সাধের পাকিস্তান
কর ভাইয়ে ভাইয়ে প্রেম আলাপন মিলে হিন্দু মুসলমান।

কিন্তু এই সুখস্বপ্ন দীর্ঘস্থায়ী হল না। নতুন শাসকদের অপশাসন, দুর্ভিক্ষ, ব্যাপক দুর্নীতি ও ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের হলকায় অল্পকালের মধ্যেই তা জ্বলে গেল। দেখা গেল, 'সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও মুৎসুদ্দী পুঁজির যে তিন পাহাড় আমাদের দেশের উপর চাপিয়া বসিয়াছিল সেই তিন পাহাড় অপসারিত হইল না। ইহারা বিদ্যমান রহিয়া গেল। সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশিক শাসনের ধরণ

কেবলমাত্র বদলাইল।'[১] ক্ষমতা হস্তান্তরের সূত্রে ব্রিটিশের অর্থনৈতিক স্বার্থ বহুক্ষেত্রেই, বিশেষতঃ পাট ও চা শিল্পে অটুট থাকল। অব্যাহত থাকল তা ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে ইতিমধ্যে প্রবেশ ঘটে গেছে আমেরিকার। শোষণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প'ড়ে দুর্বল ব্রিটিশ শক্তি আজ পাকিস্তানের অধিকাংশ বাজার সবলতর আমেরিকার হাতেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যে প্রায় অর্ধেক দখল করে নিল আমেরিকা। তার নয়া ঔপনিবেশিক চক্রান্তের জালে ক্রমশঃ জড়িয়ে পড়তে থাকল সমগ্র দেশ। তার দেওয়া সাহায্য ও ঋণের পরিমাণ বাড়তে লাগল দিনকে দিন। রমেশ শীলের মৃত্যুর বছর অর্থাৎ ১৯৬৭তে তার পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় বাইশ শত কোটি টাকায়। অথচ সাধারণ মানুষের অবস্থার শোচনীয়তাও বেড়ে চলে তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। ১৯৪৭-এর সুরুতেই বাংলা দেশের খাদ্য শস্যের দাম উর্ধ্বমুখী হতে থাকলেও ১৯৪৮-এর মার্চ মাসের দিকে গিয়েই পূব পাকিস্তানে তা প্রকৃতপক্ষে গুরুতর, প্রায় দুর্ভিক্ষের আকার নিয়ে নেয়। অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে, বিশেষতঃ সিলেট জেলায়। 'চতুর্দিকেই হাহাকারের রোল উঠিয়াছে। খাদ্য নাই, বস্ত্র নাই এবং এগুলি ক্রয় কবিবার মত সামর্থ্যও নাই।' 'মৃত্যুর করাল ছায়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে এবং অবিলম্বে এই অবস্থার প্রতিকার না করিলে অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র সমাজব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িতে বাধ্য।'[২] রমেশ শীলের চট্টগ্রামের অতিরিক্ত দুর্ভোগটুকু ছিল ঘূর্ণিবাত্যার জন্য। পূর্ববাঙলা ব্যবস্থা পরিষদে ১৪ই জুন, ১৯৪৮ খাদ্য সমস্যা নিয়ে যে দীর্ঘ বিতর্ক হয় তাতে চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের এই বিষয়ের উল্লেখ করে 'সেখানকার অবস্থার দারুণ অবনতি ঘটেচে' বলে জানান। অবস্থা এমনই হয়ে পড়ে যে কক্সবাজার থেকে দশ হাজারের মতন মানুষ ধান চাল কেনার কোন সামর্থ্য না থাকায় খাবারের সন্ধানে দেশত্যাগী হতে বাধ্য হলেন। ঐ একই বিতর্কে নেলী সেনগুপ্তা জানালেন যে চট্টগ্রামের চালের দর সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। চিনি, আটা, কেরোসিন তেল পাওয়া যাচ্ছে না, সরষের তেলের দাম সের প্রতি তিন টাকা।'[৩] মাত্র কিছুদিন আগেই 'পাকিস্তানের আর কি

১। ক্ষুধা হইতে মুক্তির পথ : আবদুল হক। ঢাকা, ১৯৭০ (বাংলাদেশ : তথ্য ও তত্ত্ব—অসীম মুখোপাধ্যায়)

২। পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন, দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ধৃত অংশ থেকে। পৃঃ ২৬—২৭।

৩। ঐ পৃঃ ৩৩—৩৭।

ভয়' কিংবা 'পতিত জমি আবাদ হলে অন্নকষ্ট যাবে চলে' বলে আশার গান গেয়েছিলেন রমেশ শীল, কিন্তু চোখের সামনে দ্রুত ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা তাঁকে ধাক্কা দিল প্রবলভাবে। এ সময়কার অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন পরবর্তী-কালের এক গানে :

লুঠের কারবার শুরু হল ২* দেখা গেল, যে যেদিকে পায়।
গরীবকে ঠকাইয়া তারা লুঠ করিয়া খায়॥
নিত্যপ্রয়োজনীয় মাল ২ বেসামাল, দাম হইল চড়া
ক্রয়ক্ষমতা কারও নাই, হাহাকার দেশ জোড়া॥

মজুতদারদেরই কবি মনে করলেন সমস্ত অভাব অনটনের একমাত্র কারণ

দেশঘাতী মজুতদার চোরাকারবারি যদি না থাকিত
সকল রাষ্ট্রের সেরা রাষ্ট্র এই পাকিস্তান হইত।

তাই স্বদেশবাসীদের তাদের সম্পর্কে সাবধান করে দিয়ে তিনি গান বাঁধলেন,

পাকিস্তানের হিন্দু মুসলিম হও ভাই হুঁসিয়ার
গরীব মারা কল বসাইল দেশের যত মজুতদার
...বছর বছর দুর্ভিক্ষ আসে, লক্ষ ভাই বোন মোদের পরাণে নাশে,
মজুতদার আনন্দে ভাসে নোটের বাক্স পুরা তার।

ইতিমধ্যে ১৯৪৮-র ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতায় হয়ে গেছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস, গৃহীত হয়েছে 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়'-এর লাইন অতীতের ভুলভ্রান্তি স্বীকার করে নিয়ে (পি. সি. যোশীও করলেন তাঁর রেডিমেড আত্ম-সমালোচনা), অবশেষে গ্রহণ করা হয়েছে বিপ্লবের অনিবার্যতার শিক্ষা, 'তেলেঙ্গানার পথ'। অবশ্য তেলেঙ্গানার বিপ্লবী তাৎপর্যটুকু পার্টিতে 'পুরনো সংশোধনবাদী লাইন' বজায় থাকার জন্যই প্রথম দিকে সঠিক মর্যাদা পায়নি। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসই 'সশস্ত্র সংঘর্ষের নতুন অধ্যায়ের সূচক ও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ প্রদর্শক হিসাবে তেলেঙ্গানার তাৎপর্য সঠিকভাবে উপস্থিত করল।'[১] তেলেঙ্গানা নিয়ে এল নতুন যুগের বার্তা, দেখা দিল 'যুদ্ধোত্তর বিপ্লবী ভারতবর্ষের প্রতীক হিসাবে।'[১] অবশ্য কংগ্রেসে উপস্থিত তেলেঙ্গানার

প্রতিনিধিরা পার্টি কংগ্রেসের দলিলের তীব্র সমালোচনা না করলে যে কী হত বলা যায় না।

পূর্বপাকিস্তানেও কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে প্রত্যাশিত পরিবর্তন দেখা গেল। তবে সরাসরি বেআইনী ঘোষিত না হলেও ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৩-র মধ্যে প্রচণ্ড সরকারী দমননীতির মুখে পার্টি খোলাখুলিভাবে কোথাও কাজ করতে পারেনি। দীর্ঘকাল সংসদীয় কাজকর্মে অভ্যস্ত থাকার জন্য এবং অন্যান্য কারণে পার্টির কর্মসূচী মূলতঃ অসম্পাদিত থাকে, ব্যর্থ হয়। দমননীতি শুধু কমিউনিস্টদের জন্য নয়, ছিল সরকারের স্বার্থবিরোধী সমস্ত কিছুরই জন্যে। ১৯৪৯-এর মে মাসে চট্টগ্রামের দৈনিক 'পূর্ব পাকিস্তানে'র কাছ থেকে জামানত তলব করার সঙ্গে সঙ্গে 'রাষ্ট্রবিরোধী' 'উত্তেজনামূলক' সম্পাদকীয় ও সংবাদ প্রকাশের ওপর সেন্সরসীপ জারী করা হল। তারপর কুখ্যাত 'জননিরাপত্তা আইন' প্রযুক্ত হতে থাকল একে একে পাকিস্তানের বহু সংবাদপত্র এবং পত্রিকা সম্পাদকের উপর। 'সরকারের সাথে সামান্য মতবিরোধ পর্যন্ত তারা দমন করতে বদ্ধপরিকর হয়ে নির্বিচারে তাদের দমননীতি প্রয়োগ করে। শুধু ঢাকা, লাহোর এবং অন্যান্য বড়ো শহর থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র পত্রিকার উপরই তাদের এই হামলা সীমাবদ্ধ ছিল না। মফস্বলের সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির মধ্যে বহু সংখ্যক পত্রিকাই সরকারের জননিরাপত্তা আইনের কবলে পড়ে।'[১]

রমেশ শীল এক সময় (১৯৪৮) জমিদারী উচ্ছেদের আহ্বান জানিয়েছিলেন :

শুন কত বন্ধু ভাই
জমিদারী উচ্ছেদ বিনা দেশের মঙ্গল নাই।

এরপর ১৯৫১-তে জমিদারী প্রথা বিলাপের আইন জারি হল কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা সামন্ততান্ত্রিক শক্তিকেই মদত দিয়ে টিকিয়ে রাখল। ঐ আইনে জোতদারী ও মহাজনী প্রথাকে মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাজনার পরিমাণও বেড়ে গেল বহু গুণ। অবিভক্ত বাংলাদেশ ছিল ২৭টি জেলা নিয়ে এবং তার খাজনার মোট পরিমাণ ছিল ৩ কোটি টাকা। অথচ ১৭টি জেলা নিয়ে গড়ে ওঠা পূর্বপাকিস্তানে খাজনার পরিমাণ এক লাফে গিয়ে দাঁড়াল ১৬ কোটি টাকায়।[২] এই শীতল তথ্য-

টুকুর আড়ালে দেশের মানুষের একটু একটু করে রক্তশূন্য হবার যে মর্মান্তিক ইতিহাস থেকে গেল তা রমেশ শীলের গানই আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট ফুটিয়ে তুলতে পারে :

এবার মানুষ বাঁচিব কেমনে
…হইলে টেক্স, মইলে টেক্স, ঘর বাড়ী গরুর টেক্স
উনত্রিশ রকম টেক্স হইল আইনে… ।

তাঁর গানে ঘুরে ফিরে আসতে থাকল গভীর আশাভঙ্গের কথা :

'সাতচল্লিশে স্বাধীন পাকিস্তান,
আশা করলাম এবার বোধহয় বাঁচিবে পরাণ
এখন ভিক্ষায় গেলে ভিখ মেলে না, দুদিন পর আর কি হয় ন জানি
স্বাধীনতার ফলে এক কি ফল, অন্নবিনে শীর্ণকায় স্ত্রী পুরুষ সকল,
বস্ত্রহীনা, ক্ষীণাতনু দেশের সব কুল কামিনী ।'
'দেশের ভাইবোনরে কত নিদ্রা যাও
মাল কোঠাতে চোর ঢুকেছে নয়ন মেলে চাও,
বৌয়ে কয় কাপড় আন পোলায় কয় ভাত ।
স্বাধীন হলাম তবু কেন এ দারুণ উৎপাত ॥
সোনার বাংলায় সোনার ধান ফলাইত চাষী
দুনিয়ার খোরাক যোগায় যে সে উপবাসী ।'

'স্বাধীনতা'র গোপন রহস্য এবার রমেশ শীল বুঝে ফেলেছেন পরিষ্কারভাবে। এ উপলব্ধি তাঁর নিছক কোন রাজনৈতিক স্লোগানজাত নয়, উঠে এসেছে নিতান্তই কঠোর কঠিন বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে। তিনি গাইলেন :

ব্রিটিশ এত রক্ত মাংস শোষিয়া নিয়েছে
এখন আবার দেশী শোষক জাঁকিয়া বসেছে
এই ধ্বংসের মূলেতে কি যদি টের পাও
গরীব এক জোট হয়ে ভাগ্য বদল করে নাও ।

গরীবের দুঃখের কথা কার কাছে জানাব বল ।
স্বাধীনতা পেলাম বটে, কানে শুনা সার হইল
স্বাধীনতা কাহার তরে মানুষ যদি না রহিল ।

এঁকি উল্টা বাতাস এল রে ভাই উল্টা বাতাস এল
মাউন্টব্যাটনী স্বাধীনতায় পথে বসাইল।...
...যারে করিতে বর্জন এত প্রাণ বিসর্জন।
এত তর্জন গর্জন করেও সে ঘরের কোণে রইল॥
দেশে কি স্বাধীনতা আসিল, মোরে জ্বালাইল।
ট্যাক্স দিয়া বাক্স খালি রাস্তায় নিয়া বসাইল।

রমেশ শীল বার্ধক্যের কোন অনুশাসন মানলেন না, নিজের শক্তিটুকু নিঃশেষিত করেও গানের মধ্য দিয়ে শাসকের চরিত্র, স্বাধীনতার স্বরূপ উন্মোচন করে চললেন :

শাদা শোষক চলে গেছে, এখনও তার বীজ আছে
ব্যাঙ্কে মিলে চা-বাগানে চিন নি...

আর একটি অসামান্য গানে তাঁর তীক্ষ্ণ শ্লেষাত্মক কণ্ঠ ঝলসে উঠল :

চাষী ভাইরে চাষী ভাই, মজুর ভাইরে মজুর ভাই।
দেখছনি ভাই চাষী মজুর ধ্বংসের নমুনা।...
একটা একটা করে চাইয়রে ভাই স্বাধীনতার গুণ
ক্রমে ক্রমে খাজনা টেক্স বাড়ে দশ বিশ গুণ।
জ্বালাইল অশান্তির আগুন কার কি ভাই অজানা
চাষী মজুর ধ্বংসের নমুনা।

দেশের ক্রমবর্ধমান দুঃখ দারিদ্র্য খাদ্যাভাবের জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রচারযন্ত্র নিয়মিতভাবে দায়ী করত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগকে। মূল প্রশ্ন যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নয় তা রমেশ শীল বোঝেন। তিনি জানেন নবাগত শিশুটি শুধু খাদ্য গ্রহণের ক্ষমতা নিয়েই আসছেনা, তার দু'টি হাতেও সুপ্ত আছে খাদ্য উৎপাদনের অপার ক্ষমতা। তাই জনসংখ্যার দিক থেকে দুনিয়ার পয়লা নম্বর দেশ চীনের উল্লেখ করে তিনি সরকারী প্রচারের উত্তর দিলেন তাঁর গানে :

পাকিস্তানের মানুষ বাড়ে কম পড়ি যায় খানা
বাতাস খাইনি বাঁচি রইয়ে সত্তর কোটি চীনা।
পোয়া হন বন্ধ হইলে পেট ভরা ভাত পাইবা,
ঘরত বই দিনে রাতে জিন্দাবাদ গাইবা
উনত্রিশ রকম টেক্স দিবা, আর কিসের ভাবনা।

গানের শেষে কবি প্রাপ্ত 'স্বাধীনতা'র অর্থহীনতা ঘোষণা করার পর শ্রমিক কৃষকের ভবিষ্যৎ ঐক্যবদ্ধ লড়াই-এর অনিবার্যতার কথা বললেন :

কি লাভ হইল বাঙালীদের স্বাধীনতা পাই
কপাল মন্দ কারে কইয়ুম, মানুষ একযোগ নাই।
একযোগেতে দাঁড়াই যদি চাষী মজুরগণ,
আকাশের চাঁদ মাটিতে আনতে লাগে কতক্ষণ
না করিলে দুঃখ বরণ সুখের আশা দেখিনা।

রমেশ শীলের কাছে গান বেঁচে থাকার একটা মাধ্যম, জীবনসংগ্রামের একটা নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার, নিছক ব্যক্তিগত অবকাশ অবসরের সৃষ্টি নয়। তাই দেশের মানুষের জীবনে কোন বড় ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, সুখের বা দুঃখের, কখনো তাঁর চোখ এড়িয়ে যেতে পারেনি। আসলে জলের ভিতর যেমন মাছ, রমেশ শীলও তেমনি জনতার উষ্ণ সান্নিধ্যে, স্বাভাবিক ও একাত্ম। সুতরাং ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ ভাষা আন্দোলনের বিস্ফোরণ যখন ঘটে গেল তখন কবির আবেগও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংযোজিত হল তার সঙ্গে :

ভাষার জন্য জীবন হারালি
(বাঙালী ভাইরে) রমনার মাটি রক্তে ভাসালি
বাঙালীদের বাঙলা ভাষা জীবনে মরণে
মুখের ভাষা না থাকিলে জীবন রাখি কেনে ॥
…ধমনীতে রক্তবিন্দু থাকে যতক্ষণ
রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্য জীবন মরণ পণ।

শাসকের দমননীতির মুখে মাতৃভাষার জন্য কবি নিজের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও লড়াই চালাবার প্রস্তুতির কথা বললেন :

আমি বাংলা ভালবাসি
আমি বাংলার, বাংলা আমার, ওতপ্রোত মেশামেশি !…
বাংলার জন্য জীবন গেলে হব স্বর্গবাসী,
আমার ঠিক থাকিবে বাংলার দাবী যদিও হয় জেলফাঁসী।

এই অনমনীয়তা ছিল মূলতঃ রমেশ শীলের চরিত্রের মধ্যে। না হলে দু' একটি ঘটনায় ছাড়া বাইরের আন্দোলনের এমন কোন নেতৃত্ব ছিল না যা তাঁর শক্তির উত্তরোত্তর বিকাশকে সুনিশ্চিত ক'রে তাঁকে পরিচালিত করতে পারে। কমিউনিস্ট

পার্টি' মাঝখানে এক বছর (১৯৫৩-র মাঝামাঝি সময় থেকে ১৯৫৪-র এপ্রিল পর্যন্ত) আইনসম্মত হওয়ায় ইলেকশানে নেমেছিল। এতদিনকার শ্বাসরোধকারী যন্ত্রণা থেকে মুক্তির সামান্য সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে রমেশ শীল নির্বাচনের গান লিখেছিলেন :

ভোট দিয়া মেম্বার করছি সুখ সুবিধার কারণে
ছিঁড়া গিরা দিয়া পরে মোদের মা বোনে,
ফাইন শাড়ী মেম্বারে নেয়, ভোট দিয়া এই পুরস্কার
আইন সভায় গরীব পাঠাও, ধনীর আশা কর না
মনে রেখ সর্বজনে ভাত কাপড়ের যন্ত্রণা
এক বৃষ্টিতে'ত বর্ষা যায় না, সামনে ভোট হবে আবার।
...ভাই বলতে কি সরম, আগে কথা কয় নরম,
ভোট পেলে হয় মহাগরম, যেতে নারি ধারে
শুন হিন্দু মুসলমান রাখ কৃষকের পরাণ,
কৃষকের দরদী পেলে ভোট দিও ভাই তারে।

ঐ যুক্তফ্রণ্ট ও লীগ মন্ত্রীসভার নির্বাচন দ্বন্দ্বে নির্বাচনী প্রচারের জন্য চট্টগ্রামে এসে মুখ্যমন্ত্রী যখন বিক্ষুব্ধ চট্টগ্রামবাসীদের হাতে অপদস্থ হলেন তখন রমেশ শীল ফেটে পড়লেন এক বিদ্রূপাত্মক গানে :

...হঠাৎ দেখি পচা আণ্ডা মন্ত্রীরে করিতে ঠাণ্ডা
উড়তে লাগলো কালো ঝাণ্ডা মন্ত্রীর চোখের উপর
বিপ্লবী চট্টগ্রাম জিলা সূর্য সেনের প্রধান কিল্লা
মন্ত্রী করে তোবা তিল্লা আসবো না জনম ভোর।

লোকের মুখে ফিরতে থাকল এই গান। আর শঙ্কিত সরকার সাতাত্তর বছরের বৃদ্ধ কবিকে নিরাপত্তা আইনে বিনা বিচারে জেলে ভরল এক বছরের জন্য। জেল থেকে কবি লিখলেন :

আমাদের খুনেতে যারা তুলেছে বড় মিনার
রক্ত মাংস চুষে খেয়ে করেছে কঙ্কাল সার
আর যে সময় নাই, ত্বরায় ছুটে এস ভাই,
বেদনার প্রতিকারের সময় এসেছে।...

যা হবার হয়ে গেছে, আর কারে কর ভর
আগ্নেয়গিরিসম দিকে দিকে ফেটে পড়
শুন সর্বহারা ভাই, এবার মোদের শেষ লড়াই
দুনিয়াময় গণডঙ্কা বেজে উঠেছে।'[১]

এসব থেকে বুঝতে অসুবিধা হয়না জ্বলে উঠবার জন্য সব সময়ই প্রস্তুত ছিলেন রমেশ শীল। স্ফুলিঙ্গেরও অভাব ছিল না সমসাময়িক ইতিহাসে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, অভাব ছিল এই সব স্ফুলিঙ্গকে দাবানলে রূপান্তরিত করবার মতন সুসংগঠিত ও সঠিক নেতৃত্বাধীন গণ-আন্দোলনের। অন্যদিকে রমেশ শীলের পরিচিত কবিয়ালদের মধ্যে, তাঁদের একতায়, তাঁদের কবিয়াল সমিতিতেই ফাটল ধরে গিয়েছিল। ভাঙ্গন ধরেছিল তাঁদের সততায়, সংগ্রামী চেতনায়। ১৯৪৮-এ রমেশ শীলের নেতৃত্বে, রাইগোপাল দাসকে সম্পাদক ক'রে, হেদায়ত আলী, ফণী বড়ুয়াকে নিয়ে নতুনভাবে তৈরী হয়েছিল কবি সমিতি, এবং গড়ে উঠেছিল ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অনুকরণে প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ। এবার রমেশ শীল নিজে বার্ধক্যের জন্য অনুষ্ঠানে, মঞ্চে কবিগান বন্ধ করলেন। আয়ুবের সঙ্গে আপসের প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় রাইগোপাল দাসকে সরে দাঁড়াতে হল কবিয়াল সমিতি থেকে। ফলে কবি সমিতি চলে গেল নবীন কবি গায়কদের হাতে। প্রান্তিক নবনাট্য সংঘের কিছু কণ্ঠশিল্পী চট্টগ্রাম বেতারে এমন সব পল্লীগীতি গাইতে থাকলেন যা সবাইকে বিস্মিত করল। চট্টগ্রাম কবি সমিতির এক শ্রেণীর কবি গায়কদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাবও দেখা গেল। তাঁরা আয়ুব শাহীর প্রচার শুরু করলেন। কবির লড়াই ছাড়া এক পক্ষের কবিগান নাম দিয়ে—('চট্টগ্রামের কবিগানের ইতিহাস') গান শোনা গেল :

'আছে খ্যাতি বীরের জাতি আমরা মুসলমান
কর ধ্বংস শত্রু বংশ ছুটো নওজোয়ান
...হাঁকিয়া হাঁক মার রে ডাক আল্লাহ আকবর।
ভয়ের তুফান ছুটবে জোয়ান দুশমনের ভিতর' ইত্যাদি।

১। 'রমেশ শীলের শ্রেষ্ঠ গান ও ছড়া'র সংকলনে এই গানটি প্রকাশ করবার সময় (১৯৬৪) সম্পাদকমণ্ডলী আইনের কথা ভেবে আতঙ্কিত হয়েছিলেন। কবিতার তলায় তাঁদেরই একজনের একটি মন্তব্য ভ্রমক্রমে ছাপা হয়ে যায় : "কবির লেখায় 'প্রতিশোধ' আছে—আইনের দিক বিবেচনা করবেন।"

রমেশ শীলের এই সাধের কবি সমিতি যা পঞ্চাশের মন্বন্তরের ভয়াবহতার মধ্যেও সংঘবদ্ধ হয়েছিল নতুন ভাবে, অসাম্প্রদায়িকতা ও আপসহীনতাকে করেছিল সংগঠনের ভিত্তি, তারই হল আজ এই পরিণতি। আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী, স্বার্থান্ধ দোদুল্যমান সমসাময়িকদের বিচ্যুতি বিশ্বাসঘাতকতার এই পটভূমিতেই বিশেষ করে কবির জীবনের বিরামবিহীন একাগ্র সংগ্রাম আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত ক'রে দেয়।

তবে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন সমালোচনা যে ওঠেনা তা নয়, ওঠে। লক্ষ্য করি তাঁর কিছু পিছুটান। যেমন, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অভাব অনটন ও শোষণের ছবি তুলে ধরতে, কবিয়াল হিসাবে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই, তিনি যে পরিমাণ আগ্রহী তার তুলনায় শোষক শ্রেণীর স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে তাঁর আগ্রহ নিতান্তই কম। এই ক্ষেত্রে তাঁর বোঝার মধ্যেও কিছুটা গলদ থাকা হয়ত অসম্ভব নয়।

বড়লোক-গরীব লোকের দ্বন্দ্ব, তাদের শোষণের সম্পর্কটা তিনি জীবনে প্রতি মুহূর্তের সংগ্রামের দৌলতে মর্মে মর্মে বোঝেন। মজুতদার কালোবাজারীরাও তাঁকে সরাসরি স্পর্শ করে তাঁর অভিজ্ঞতার গণ্ডির মধ্যেই। সর্বোপরি, হতেও পারে 'জনযুদ্ধে'র সময় কমিউনিস্ট পার্টি 'মালিক মজুতদার'কে প্রধান শত্রু হিসেবে সেই যে চিনিয়ে দিয়েছিল তা তিনি ভোলেননি কখনও। এই সব কারণেই তাঁর গানে মজুতদার চোরাকারবারীরাই প্রধান শত্রু হিসাবে বারবার উপস্থিত হয়, অথচ রাষ্ট্রযন্ত্রের উৎপীড়ক চেহারা বা তার শ্রেণী-শোষণের বহুরূপী চরিত্রের মুখোস উন্মোচন, বিশেষ পাওয়া যায় না কোথাও। সুতরাং গণকবিয়াল হিসাবে রমেশ শীলের বিকাশ একটা স্তরে পৌঁছে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই আবদ্ধতা কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মতন শক্তি কবির ভিতর যে ছিল না তা স্বীকার করতেই হবে, উপরন্তু তিনি বিভিন্ন সময় কমিউনিস্ট পার্টির কিছু কিছু শ্লোগানের উপর একটু যেন যান্ত্রিকভাবেই নির্ভরশীল ছিলেন। অন্যদিকে বাইরে থেকে কোন সংঘবদ্ধ শক্তি বা ব্যক্তি তাঁর এই সীমাবদ্ধতা দূর করতে, রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা স্বচ্ছতর করে তুলতে কোন রকম চেষ্টা করেছিলেন বলেও আমাদের জানা নেই। এই ভাবে একটা দুঃখজনক অসম্পূর্ণতা জড়িয়ে থেকে গেল রমেশ শীলের গণকবিয়াল জীবনের সঙ্গে।

কিন্তু এ সব সত্ত্বেও রমেশ শীল আমাদের অবাক করে দেন। আমরা কখনো ভুলতে পারিনা তাঁর সেই গানের কথা যেখানে তিনি এঁকেছেন তীব্র শ্রেণী-শোষণের ছবি :

…আমার খুনে মটর গাড়ী, তেতালা চৌতালা বাড়ী,
আমার খুনে রেডিও আর বিজলি বাতি জলে,

গেয়েছেন শ্রেণী-সংহতির অসীম শক্তির জয়গান :

আমি কৃষক তুমি মজদুর দিনে রাতে খাটি
দুই শক্তি এক হলে মোরা পিছু কবে হটি,
এক সঙ্গে নিঃশ্বাস ছাড়ি পর্বত উড়াতে পারি।

ভোলা সম্ভব নয় তাঁর সেই অনবদ্য গান যেখানে আজীবন সংগ্রামী গণকবিয়ালের সংগ্রামের মূল মন্ত্রটুকু উচ্চারিত :

অত্যাচারের প্রতিশোধ আমার নেওয়া নাইবা হবে,
আমার পরে আসবে যারা বোধকরি তারাই নেবে।
সারা জীবন ধরে আমি তারই চেষ্টা করে যাব।
মনের কোণে সুর উঠিবে, কলম দিয়ে তাল বাজাব,
লাল মেঘেতে করবে খেলা আকাশ ভরা জোছনা রাতে।
দোল খেয়ে জলবে বাতি প্রতি ঘরে লাল শিখাতে।
তার আলোতে স্বপ্ন সফল করবে মুক্তি পূজারীরা
সেদিন হবে জানা জানি দোস্ত কারা দুশমন কারা…।

এইভাবে নিজের মৃত্যুর পরও ভবিষ্যৎ ইতিহাসের বিজয়ী শ্রমিক-কৃষকের লড়াই-এর মধ্যে রমেশ শীল তাঁর 'স্বপ্ন সফল' হবার কথা ঘোষণা করলেন।

রমেশ শীলের গান

১

আর যায় না চুপ করে থাকা।
যতীন্দ্রবাবুর নেতৃত্বে বন্ধ হবে রেলের চাকা।
মজদুরের একতা জোরে, রেলের বিটে মরিচা পড়ে।
আমার রক্তে উদর পুরে, আমাকে ডেম ব্লাডি ডাকা॥
ব্যবসার ছলে বণিক এল, ডাকাত সেজে লুট করিল,
মাল-কোঠার ধন হরে নিল, আমারে সাজায়ে বোকা॥
কৃষক মজদুর একযোগেতে, হাত মিলালে হাতে হাতে
শ্বেতাঙ্গ দুশমনের হাতে তবে যাবে জীবন রাখা॥

(১৯২২-এর রেল ধর্মঘটকালীন গান)

২

আমাদের চোখ ফুটেছে মুখ ছুটেছে ভয় করিনা।
ব্রিটিশ নিল দেশ লুটিয়া, উঠছে মোদের চোখ ফুটিয়া
আমরা আর থাকব না চেয়ে কুকুর খাবে দুধের ছানা॥
দেখে তোদের চোখ রাঙানি, মনে কি আতঙ্ক গণি?
ঢোঁড়া সাপের ফোঁস ফোঁসানি, আমরা কিরে ভেকের ছানা?
খুব বুঝেছি ঢের সহেছি, তাই যে এগিয়ে এসেছি
উম্মূলের সময় পেয়েছি রত্তি মাষা কম নেব না॥

বিভেদ আগুন দিয়া জ্বালি, ভাইয়ে ভাইয়ে ঘর ভাঙালি,
শোষণ করিস পোষণ ভুলি, তোকে তোষণ করা যায় না।
খলিফাকে গদি দিবি, নয়ত এবার বিলাত যাবি
এই দুইটার একটা হবে, হিন্দু-মুসলিম মাফ করবেনা॥

চট্টগ্রাম, ২১ | ৫ | ২২

(খিলাফৎ আন্দোলনের সময়ের গান)

১৯২৫-১৯৩০

মাইজভাণ্ডারের যুগ

৩

ভাবিস কেন মন কুভাবনা দিন গেলে দিন আর হবে না।
তুই আইলি একা যাবি একা তার জন্যে কেন আনাগোনা॥
বিষয় রসে মজে রইলি স্ত্রী-পুত্র ভেবে আপনা।
তোর শেষের দিন হলে উপস্থিত আপন কি পর যাবে জানা॥
একূল ওকূল দুকূল খেয়ে বসে কর কি ভাবনা।
দারুণ মায়ার বেড়ি কাটবি কিসে চেতন-গুরুর সঙ্গ বিনা॥
চেতন-গুরু চেতন করে অচেতন কখন রাখে না।
অচেতনে অচেতনকে জাগাতে কখন পারে না॥
রমেশে মিলেছে গুরু নিত্য চেতন আছে জানা।
জেনে শুনে কর্ম গুণে মন বেটা কথা মানে না॥

৪

তোরা দেখবি যদি ত্বরায় আয় এক থামেতে ঘর বেন্ধেছে বন্ধুয়ায়।
ঘরের নয় দরজা উল্টা কলে বাতাস খেলে সর্বদায়।
প্রাণ বন্ধুয়া আজব কারিগর একতালাতে সাত তালা ঘর
কৈল্ল মনোহর।
বন্ধুর প্রত্যেক তালায় ফুল বিছানা নিত্য থাকে সাততালায়।

প্রথম তালায় আছে সাপিনী
ঘুমের ঘোরে সুধা পিয়ে মস্তকে মণি,
সাপের মন্ত্র না জানিয়ে ধরলে শেষে প্রাণ হারায়।
মণিরাম সিং ঘরের চকিদার,
ছয়জন চোরে চুরির আশে ঘুরে অনিবার
বন্ধুর মাল-কোঠার ধন হবে ছারখার চোরে যদি চাবি পায় ॥
ভেবে চিন্তে রমেশ পাগলা কয় কার অভাবে ঘরখান নষ্ট
চিন্ত এই বিষয়।
ঘরের মালিক চিন্‌লে ভাই ঠিক মাইজভাণ্ডারে গুরুর বাড়ি
চলি আয় ॥

৫

ভবসমুদ্রে ঘুরে আমার দেহ স্টীমার।
মন তুফানী পাপের মালে বোঝা কৈল্ল ভার ॥
আশা ছারাং মায়া টেণ্ডল, লাইটমেন দশ ইন্দ্রিয় দল,
বায়ু জল আগুনেতে কল ভাণ্ডারী ড্রাইভার ॥
ঊর্ধ্ব তালা সিদ্ধদলে বিদ্যুতেরি আলো জ্বলে,
সুষুম্না নাড়ীতে খেলে ইলেকট্রিকের তার ॥
ভাঙ্গলে তরী যায় না গড়া রগের জোড়া জলই ছাড়া,
পেলেম না ত্রিবেণীর ধারা, কি ভাগ্য আমার ॥

৬

মানুষ হবি কেমন করে,
পশুর ভাবে দিন কাটালে মানুষের আকারে ॥
পাইয়ে দুর্লভ জন্ম, বুঝলি না জন্মের মর্ম,
হারা হলি ধর্ম কর্ম, মায়ার ভুলে পড়ে ॥
সাধে সাধে ফাঁস লাগালে মায়া রজ্জু জরে—
উপস্থ উদরের জ্বালায় পাগল করে তুলল তোরে ॥

এখনও মঙ্গল জেনে, গিয়ে ভাণ্ডারীর স্থানে,
ধর তার রাতুল চরণে নিষ্ঠা ভক্তি করে।
সে পারের কর্তা সকল বার্তা বলে দিবে তোরে—
তোর জন্মাবধি যাহা হয় নাই এক পলকে হতে পারে ॥
ভেবে চাও আপন দিলে, ভাণ্ডারীর কৃপা হলে
শুক্‌না গাছে অঙ্কুর মেলে চে'লে এক নজরে।
পশুত্ব ঘুচায়ে মনুষ্যত্ব দিতে পারে—
রমেশ কয় হলেম না মানুষ ঘুরে মরি কর্ম ফেরে ॥

৭

তার ঘরে থাকা বিষম দায় প্রেমের বাতাস লাগ্‌লোরে যার গায়।
ও তার জীবনমরণ সমান কথা কুল ধর্ম সব হারায় ॥
যারে প্রেম-নিশায় ধরে গৃহবাড়ি পুত্র নারী সকল পাসরে।
সে ফুলের রেণুর শয্যা করে শুইলে অঙ্গ না জুড়ায় ॥
যে জন প্রেমে মজেছে প্রেমের মরা মরে আগে অমর হয়েছে,
সে লোকলজ্জা পায় ঠেলেছে কলঙ্কের বোঝা মাথায় ॥
(রমেশ বলে) শুন বন্ধুগণ আমার বাবা মাইজভাণ্ডারী প্রেমের মহাজন।
ভক্তিভাবে করলে সাধন অধর চাঁদকে ধরা যায় ॥

৮

বন্ধু কি টোনা জানে একটুখানি দৃষ্টি করে পরাণ ধরে টানে,
যে দিন হতে প্রথম দেখা নয়নে নয়নে।
অন্ন জল নাহি রুচে এই পোড়া পরাণে ॥
বন্ধুর আশে ভ্রমি আমি সদা বনে বনে।
সাপে খেলে বিষ না লাগে বন্ধুর নামের গুণে ॥
বন পোড়া হরিণীর মত জলি নিশিদিনে।
রইতে কইতে সইতে নারি যে জ্বালা মোর প্রাণে ॥
ধরতে গেলে ধরা দেয় না আশা দিয়ে এনে।
না বাঁচিলেও বাঁচি রমেশ কাজ কি এই জীবনে ॥

৯

আমার প্রাণ বন্ধুয়ার রংমহলা দেখবি যদি আয়।
রহমান মন জেলে বন্ধু প্রেম খেলা খেলায় ॥
রহমান মন জেলে বসি, ফুকিছে তৌহিদের বাঁশী
বাঁশীর সুরে মন উদাসী প্রাণ নিয়ে যায় ॥
নূরের খেলা রংমহলা, আট কোঠরী ষোল তালা।
মাইজভাণ্ডারী চাবিওয়ালা বিনে নাহি উপায় ॥
বলে রমেশ মতি মন্দ, সেই খেলায় যার মন সন্দ।
নিশ্চয় তার ভাগ্য মন্দ জন্ম-অন্ধের প্রায় ॥

১০

প্রাণ বন্ধুয়ারে, আরো কি কাঁদাবার আশা মনে।
[প্রাণ বন্ধুয়ারে] পিরিতির একি রীতি, আগুনে করি বসতি,
নানা লোকের নানা কথা শুনে।
তুমিও হলে নির্দয় আশায় কি আর জীবন বয়,
এই ভাবনা উঠে নিশি দিনে
[প্রাণ বন্ধুয়ারে] সুখের আশায় প্রেম করা এখন দেখি দুঃখে ভরা,
দগ্ধ হলেম বিরহ আগুনে।
জীবনের আশা ছেড়েছি, পর্দাখানি উঠালে বাঁচি
একটুখানি দেখিলে নয়নে ॥
[প্রাণ বন্ধুয়ারে] গগনে এক দিনমণি, হাজার হাজার কমলিনী,
চেয়ে থাকে দিনমণির পানে।
ভালবাসার দিবাকরে সকলের প্রাণ শান্ত করে,
আমায় তুমি বাদ দিতে চাও কেনে।
[প্রাণ বন্ধুয়ারে] দেখিব তোমার মুখ, ছেড়েছি দুনিয়ার সুখ,
এই আশা আছে আমার মনে,
রমেশ কয় কেন ছল করতেছ, আমার ভিতর তুমি আছ
তুমি যেথা আমিও সেখানে।

১১

কেমনে পাইব তোমার দেখা রে বন্ধু
দেখা পাব আশা করে, ঝাঁপ দিয়েছি রূপ সাগরে,
হৃদ মাঝারে ছবি আছে আঁকা ॥
অদর্শনে কাঁদি আমি, একি রঙ্গ কর তুমি,
গোপন ঘরে পর্দার আড়ে ঢাকা ॥
প্রেম-চুম্বকের আকর্ষণে মন-লোহাকে সদাই টানে
ধৈর্য ধরে যায় না ত আর রাখা ॥
কি বুঝিবে ভাব ভিন্ রমেশকে না দিলে চিন
মূল প্রেমেতে তুমি আমি মাখা ॥

১২

আমার ভাবের ঘরে আগুন দিল কে রে
সদাই প্রাণ খুঁজে বেড়ায় তারে।
আমার বন্ধু বিনে মনের আগুন কে নিবাতে পারে ॥
সুখ শয়নে স্বপনে, বসে মম হৃদাসনে
সেই অবধি আমার প্রাণে ঘরে যেতে বাহিরে টানে,
কি টোনা করিল বন্ধু মোরে
রূপ তোমার অপরূপ, যেই রূপেতে সর্বরূপ স্বরূপে থাক রূপের ঘরে।
আমার সেই রূপে ভুলিল আঁখি আমারে কিরূপে রাখি
ফাঁকি দিয়ে ফির আড়ে আড়ে ॥
তোমার অদর্শনে বারি, নয়ন বারি অনিবারি,
এই বারি নিবারি কেমন করে।
আমি অগাধ জলে ঝম্প দিব, নয় অনলে প্রবেশিব,
যদি বন্ধু না দেখি তোমারে ॥
এবে সে বুঝিনু আমি নিমায়া নিঠুর তুমি,
দয়া নাই তোমারি শরীরে।
রমেশ কয় প্রাণসখা, একটুখানি দিয়ে দেখা,
যাহা ইচ্ছা তাহা কর মোরে ॥

১৩

মন রে এদেশেতে প্রেমিক নাই, চলরে প্রেমিকের দেশে যাই ॥
পেলে মনের মতন প্রেমিক রতন, তার প্রাণেতে প্রাণ মিশাই
সাম্য মৈত্রী করুণার যে দেশ,
প্রেমানন্দে প্রেমিক করে সে দেশে প্রবেশ
প্রেমিক নয়ন-ঠারে কথা বলে, মুখে কিন্তু আলাপ নাই ॥
যেই দেশে নাই ঘৃণা লজ্জা ভয়
নাই হিংসা নিন্দা মান অভিমান, প্রেমিক তথা রয়,
নাই জাতের বিচার সব একাকার ছোটবড় চিহ্ন নাই ॥
প্রেমিকের দেশে নিত্য এক সমান
শীত উষ্ণ লাভে লোকসানে সদাই সমান জ্ঞান,
আনন্দধাম ধন্দশূন্য পাপপুণ্যের আর জায়গা নাই ॥
রসরাজ রসিকের প্রেম দরবার,
নিত্য রসে নিত্যের দেশে, মওলা মাইজভাণ্ডার,
রমেশ ভাগ্যের ফলে কবে জানি সে দেশ পাই ॥

১৪

আমার প্রাণে খোঁজে মাইজভাণ্ডার।
নিন্দা করলে কি ক্ষতি আমার।
নিন্দুকেরা নিন্দা করুক, নিন্দা করা স্বভাব তার ॥
কিসে হারাম হল তাল,
তালে লোহা পিটে বানায় দা ছুরি কোদাল
তালে মাটি পিটে কুলাল, ভাণ্ড বাসন হয় তৈয়ার ॥
দেখ খোদার তৈয়ার ঢোল,
দুনিয়াময় চামড়া ছানি ভিতরে তার খোল,
নানা শব্দে বাদ্য বাজে শুনতে লাগে চমৎকার ॥
শুন যত বন্ধুগণ, নিন্দুকেরে তোমরা কভু ভেবনা দুশমন,
তারা তরিকতের ধোপার মতন ধুয়ে করুক পরিষ্কার।

খাদেম রমেশের বাণী,
প্রাণ দিয়েছি পীর কদমে যা করেন তিনি।
ঐসব নিয়ে টানাটানি করা আমার কি দরকার ॥

১৫

দেখে যা রে মাইজভাণ্ডারে আজব রং-এর ফুল।
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে পড়ে আশেক অলিকুল ॥
ফুলের রং দেখেছে যারা হয়ে গেছে আত্মহারা।
দুনিয়ার সুখ চায় না তারা, চায় না জাতির কুল।
ফুলের সুঘ্রাণ নাকে গেলে হৃদয়ে আনন্দ খেলে,
তারে খাঁটি মানুষ ক'রে তোলে অকূলে পায় কূল ॥
সেই ফুলেরি সুবাতাসে দিল খোলে আর আঁধার নাশে
নিত্য রসে চিত্ত ভাসে প্রেম বাগে বুলবুল ॥
রমেশের এই পাপ নয়নে ফুল দেখেছে ভাগ্যের গুণে,
ডালপালা তার ত্রিভুবনে শূন্যেতে তার মূল ॥

১৬

মন অহঙ্কারে দিন কাটালি মানুষ হবি কেমন করে।
তোর সাধন ভজন নষ্ট হইল, হিংসা নিন্দা অহঙ্কারে।
জেলে ধোপা মুচি জাতি, এক সকল ব্যবসার খ্যাতি,
মূলে সকল মানুষ জাতি, আর জাতি নাই এই সংসারে ॥
জাতি গৌরব বাবুআনা এই গৌরব তোর ভুল ধারণা,
কুলের খবর নাই তোর জানা, কুলীন হবি কোন বিচারে।
জমিদারী পাকা বাড়ি এই নিয়ে তোর অহঙ্কারী,
নকল ধন দুনিয়াদারী, আসল ধন তোর মাইজভাণ্ডারে ॥
রমেশ কয় মন কর্মনাশা, ছাড় ধন গৌরবের আশা,
যেই আশায় দুনিয়ায় আসা হরদম থাক সেই আশা ধরে ॥

১৭

হিন্দু-মুসলমানে দ্বন্দ্ব কোন্ কথায় সাধনায়
জাতি-কুলের টান থাকিলে জাতি কুলে সময় যায়।
একটি গুরু জগৎ-জোড়া, এক পিতারি ছেলে মোরা।
যার যেইটি ভজনের ধারা আপত্তি কি আছে তায়॥
তুমি অনলে অনিলে, ভূধরে কিবা সলিলে,
সেই ছাড়া স্থান নাই বুঝিলে, দ্বন্দ্বই র'ল কোন জা'গায়॥
সত্য ধর্মের এই নিরূপণ সর্বভূতে প্রভু দর্শন,
সাকার নিরাকার সে একজন যে যেদিক সুবিধা পায়
বিনয় করে রমেশ বলে বাদ বিবাদে কি ফল ফলে,
জাতি মানে শীলে কে কবে খোদারে পায়॥

১৮

প্রেম নদীর দুই ধারা,
এক ধারাতে বিষের পানি, আর এক ধারা রসে ভরা
যাহারা রস সন্ধানী, গুরুর কাছে সন্ধান জানি
প্রেম নদীর ধারা চিনি, ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা,
প্রেম রসে আকণ্ঠ পুরে থাকে মাতোয়ারা
যদি রাস্তা হারায় পীর ফিরে চায় মধ্যে মধ্যে দেয় ইশারা।
রসিক চৈতন্য রসে, হাঁসের মত রসে ভাসে,
গোপনে অমৃত চোষে কেহ পায় না সাড়া,
গুপ্ত ধনের ধনী হয় সে ধনে ভাণ্ড পুরা,
তারা রস পিয়ে আর রত্ন তোলে রসিক সুজন ডুবালুরা।
নদীর ধারা না চিনি, যে ধারায় বিষের পানি,
ঝাঁপ দিলে হয় প্রাণে হানি অকালে যায় মারা।
গুরু ওঝা ঠিক থাকলে মরেও বাঁচে তারা
রমেশের কপালের ফলে পেলাম না প্রেমরসধারা॥

১৯

সরলে গরলে মিশেনা। সাধুরে ভাই প্রেম ত সকলে জানে না।
প্রেমের প্রেমিক বটে যারা, প্রেম নিয়ে মাতোয়ারা,
প্রেম বিনে আর কিছুই জানে না।
প্রেমের বিষে যারে ধরে, জ্ঞান থাকে না বাঁচে মরে,
চোখ দেখিলে আল্‌গে যায় চিনা।
ইছুপ আর ও জলেখা নারী, আর দেখি ফরহাদ শিরী,
প্রেম করিল তারা কয়জনা।
প্রেমিক ছিল লায়লা মজনুন, দেখাইছে প্রেমেরি গুণ,
আগুন পানি কিছু মানে না॥
প্রেমেতে হইয়ে উতলা, প্রেম করিল গোপবালা,
নন্দের কালা শ্যাম ফেলে সোনা।
চণ্ডীদাসের রজকিনী, প্রেম কইরেছে তারা জানি,
এক মরণে মরে দু'জনা॥
প্রেমে হনু বক্ষ চিরে বিল্বমঙ্গল চিন্তা ছাড়ে
তপ্ত তৈলে বাঁচে সুধন্বা॥
রমেশ কয় বলিনা মিছে মন রইল কামিনীর পিছে
কাম চিনিলাম, প্রেম চিনিলাম না॥

১৯৩০-১৯৪৭

সন্ত্রাসবাদ, দুর্ভিক্ষ, দেশ বিভাগের পর্ব

২০

জালালাবাদ! জালালাবাদ!
শহীদ খুনে রাঙ্গা তুমি জালালাবাদ! জালালাবাদ!
দুশমন হঠাতে তব বক্ষ মাঝে রুখিয়া দাঁড়াল বীরের দল,
অসীম প্রতাপে যায় বীরদাপে, সঞ্চারিয়া দেহে নবীন বল।
ভঙ্গ দিল ত্রাসিত শ্বেতাঙ্গ, টুটিল তাদের ধৈর্যের বাঁধ।

সূর্য উঠিল তূর্য নিনাদি, জ্যোতিষ্ক মণ্ডল ভাতিল তায়,
হটিয়া গেল বিপক্ষ সেনানী, মনেতে গণিল পরমাদ ॥
বাজিয়া উঠিল বিজয়ের ভেরী, দিক দিগন্ত উজ্জালা,
অযুত কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল বীর প্রসবিনী চট্টলা।
বীরের দেশে জনম লভেছি, পূর্ণ হয়েছে মনোসাধ ॥
শহীদ খুনে রাঙ্গা তুমি জালালাবাদ ! জালালাবাদ !

গোমদণ্ডী, ২৮ | ৮ | ৩০

২১

দেশ জ্বলে যায় দুর্ভিক্ষের আগুনে
এখনও লোক জাগিল না কেনে ॥
দিন মজুর ঘরজা যারা, গত সনে মরেছে তারা
ঘরের ছানি দিব আজ কেমনে।
মরে গিয়েও যারা আছে তারাও মরতে বসেছে,
অনাহার আর রোগের পীড়নে ॥
দুইবেলা কেহ খায়না, কেহ কারো পানে চায় না।
ভিক্ষা পায় না অন্ধ আতুরগণে।
অনাহারে শরীর জীর্ণ মার বুকেতে দুগ্ধশূন্য
দুগ্ধপোষ্য মরে দুগ্ধ বিনে ॥
পুত্র কন্যা বেচে পিতা ছেলের আহার খাচ্ছে মাতা
দয়া নাইকো কাহারো পরাণে।
অন্নবস্ত্রে পেয়ে কষ্ট কত সতীদের সতীত্ব নষ্ট
দারুণ এই উদরের কারণে।

(পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়ের গান)

২২

আমার সোয়ামী গেল গৈ দেশ ছাড়ি—
এই দুনিয়ার জ্বালা আমি সইতাম রে ন পারি ॥

এই রাড্ (দুর্ভিক্ষ) আসিল আঁয়ারার (আমাদের) লাই (জন্য)
চৈল (চাল) ন পাই কোন্ডে (কোথায়) গেলগৈ তাঁন (তাঁর)
ওদ খোদ (খোঁজখবর) নাই
ঘরত থাইকত ভালা হৈত কৈত্য (করত) মেলেটারীর চায়রী (চাকরী) ॥
জাউ, খেচুড়ি পাইয়ম (পাব) বলি লঙ্গরখানাত্ যাই—
হক্কলে পাইলরে খানা আঁর ভাগ্যত্ নাই ।
পেডর (পেটের) রোগে গেলগৈ যাদু সিনার মধ্যে ছেল্ মারি ॥
পোয়া মরি মাইয়া আছিল, ফুলি হই গেল্ তুজ (ফুলে মোটা হয়ে গেল)
দুন্নুয়ারে (দু'জনকেই) হারাই আমার মন ন পায় বুঝ,
অসম বরিষার কালত্ ধরগাঁন (ঘরখানি) আঁয়ার গেল পড়ি ॥
কন্‌টকদারগ্যার ঘরত গেলাম কৈত্তাম তার খেছমত
দারুণ পেডর লাই আমি ন চাইলুম ইজ্জত,
হারা গায়ে উটি গেল্ ঘা দাবাই ন পাই দেশ ভরি ॥

গোমদণ্ডী, ১০ | ৩ | ৪৩·

২৩

জ্বলে পুড়ে গেল দেশ অত্যাচারের একশেষ
দেশবাসী হিন্দু মুসলিম ঘুমাইও না আর ।
দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ি পঁয়ত্রিশ লক্ষ গেল মরি
আবালবৃদ্ধ মইল কত হাজারে হাজার ॥
তার উপরে কাপড়ের জ্বালা যত সব কুলবালা
ঘরের বাহির দিনের বেলা হতে নারে আর
কেহ আত্মহত্যা করে কোন পুরুষ নারী ছাড়ে
পেপারের খবর তার পাই অনিবার
কনট্রাকটার ডিলারের নারী শাড়ী পরে মাজা নাড়ি
গরীব বেটার বৌ বেচারী ছেঁড়া তেনা সার ॥
এই দুর্দিনে প্রাণ বাঁচাতে এদেশ বাসী একসাথে
ভোট দিয়ে করে দিলাম প্রেসিডেণ্ট মেম্বার ।

এখন চৌকিদারী টেক্স বিনা, কেরোসিন তো পাওয়া যায় না
রোগীর জন্য চিনি পাইনা আচ্ছা সুবিচার ॥
মেয়ে মানুষ বেচা কিনা জীবনে যাহা শুনিনা
নোটের আশে হল দেশে এই এক অত্যাচার।
কাগজরে তুই কোথায় ছিলি নোট হয়ে দেশে আসিলি
তুই সে অঘটন ঘটালি তোরে নমস্কার ॥

কধুরখিল, ১১।৩।৪৩

২৪

আয়রে ত্বরা করে আয়রে কৃষক মজুর দল।
ভাইয়ে ভাইয়ে সম্মেলনে বেড়ে যাবে বুকের বল ॥
সারাদিন খেটে খেটে
তবু অন্ন নাহি জুটে
মজুতদারে নিচ্ছে লুটে হচ্ছে মোদের ভিটা তল ॥
পশু পয়মাল কিরা কাটা
ঐ দুঃখ মোদের বুঝবে কেটা
কোর্টে নিলাম বাড়ি ভিটা বর্গা জমিন চষার ফল ॥
রোগের জ্বালায় দেহ গেল
বীজ ধান সব ফুরাইল
মড়কেতে গরু মৈল, টুটে গেল বুদ্ধি বল ॥
যদি জমিদার দুঃখ বুঝিত
বাকী খাজনা মাপ করিত
কৃষকের আনন্দ হইত বাড়াইত দ্বিগুণ ফসল ॥
এই নিদানে প্রাণ বাঁচাতে
এই দেশবাসী এক সাথে
এক জোটেতে এক বুদ্ধিতে এক হয়ে সকলে চল ॥

বাগোয়ান, ১৯৪৩

২৫

ওরে বাঙালী ভাই, কৃষ্টি ছেড়ে চলেছ কোথায় ?
বার আউলিয়ার দেশ তোমার চট্টগ্রাম,
বাংলা বিখ্যাত তার নবীন সেনের নাম ॥
তোমার দেশে দেশপ্রিয় যতীন ব্যারিষ্টার,
জন্মভূমি ভুলে যাওয়া সাজেনা তোমার ॥
এই বাঙালী স্বাধীনতায় রক্ত দিল আগে।
এই বাঙালী আন্দোলনের থাকে পুরোভাগে ॥
এই বাঙালী ক্ষুদিরাম ফাঁসি কাষ্ঠে উঠে।
এই বাঙালী সূর্য সেনে অস্ত্রাগার লুঠে ॥
এই বাঙালী যতীন্দ্র দাস মৃত্যুজয়ী বীর।
এই বাঙালী সুভাষ বসু মুকুট বাঙালীর ॥
এই বাঙালী কাজেম আলি দেশপ্রেমিক সেরা।
এই বাঙালী আব্দুল করিম সাহিত্য রসভরা ॥
এই বাঙালী নজরুল ইসলাম লিখে 'অগ্নিবীণা'।
এই বাঙালী মধুসূদনের কাব্যামৃত সোনা ॥
এই বাঙালী জগদীশ বেতার বার্তা গড়ে।
এই বাঙালী চিত্তরঞ্জন দানেশ বলে যারে ॥
এই বাঙালী শরৎ, বঙ্কিম, মহর্ষি দেবেন্দ্র।
এই বাঙালী বিশ্বকবি কবীন্দ্র রবীন্দ্র ॥
এই বাঙালী মুকুন্দ দাস গানে জাগায় দেশ।
এই বাঙালীর গৌরব গাথা গণনায় নয় শেষ ॥
এই বাঙলার হিন্দু আর মুসলমান।
একযোগে দাঁড়িয়ে রাখ জন্মস্থানের মান ॥

৫ | ৭ | ৪৩

২৬

কোথায় গেলা আমারে ছাড়িয়া, ও পরাণের বন্ধুরে,
টাকার আশে রেঙ্গুন গেলা, পুনঃ ফিরে না আসিলা,
দুষ্ট জাপানে রাখিল বান্ধিয়া ॥
কোলের ছেলে নিয়া কোলে, যাদুরে বাঁচাব বলে,
ভিক্ষা মাগি দ্বারে দ্বারে গিয়া ॥
তিন দিনের অনাহারে ক্ষুধার জ্বালায় মা মা করে
শিশু প্রাণ ত্যাজিল আমার মুখ চাইয়া ॥
রূপ যৌবন দেখিয়া মোর, গুণ্ডাগণে করে জোর,
টাকা কাপড় অলঙ্কার দেখাইয়া ॥
পতি রইলা পরবাসে, পুত্রহারা হইলাম দেশে
কেমনে যাইগো ঘরের বাহির হইয়া ॥

গোমদণ্ডী, ১৭ | ৮ | ৪৩.

২৭

দেশ আমাদের শান্তির আধার মা যে তুমি জন্মভূমি
বাংলা মায়ের কোলে থাকি খেতে শুইতে তোমায় নমি।
তোমার কোলে ফলে ফুলে কিবা শোভা শ্যামল দোলে।
দোয়েল শ্যামার আকুল তানে ভাবুক প্রাণে উদাস আনে,
যাব না আর কারো কোলে থাকবো তোমার চরম চুমি ॥
তোমার কোলে জনম মরণ, তোমার কোলে জীবন যাপন,
মুক্তাকাশে মুক্ত বাতাস পরশে জুড়ায় জীবন,
অফুরন্ত শস্য ভাণ্ডার ধন ধান্যে মা যে তুমি ॥
চাঁদের আলো আকাশের গায়, মলয় পবন সুবাস বিলায়
সাগর পথে নদীর গতি, প্রাণে যোগায় মিলন স্মৃতি,
দাও বুকে বল, সেবক সকল, তোমার সেবা চায় দিবাযামি
মা তুমি জন্মভূমি ॥

গোমদণ্ডী, ১৩ | ৩ | ৪৪.

২৮

প্রিয় ছাত্রগণ, শিক্ষা মোদের বিশেষ প্রয়োজন।
শিক্ষা বিনে কোন কর্ম হতে নারে সম্পাদন ॥
এক হয়ে দাঁড়াও সবে হিন্দু মুসলিম ছাত্রদল
তোমরা দেশের মুক্তিসেনা তোমরাইতো ভরসার স্থল
তোমরা বিনে দেশের মঙ্গল হতে নারে কদাচন। (ধুয়া)
প্রাইমারী স্কুল দেশের নষ্ট হতে বসেছে,
গাছের গোড়া নষ্ট হলে ডাল পালা কয়দিন বাঁচে,
কাগজ কালির দাম বেড়েছে কিনতে পারে কয়জন।
শিক্ষকের বেতন পোষায় না কিসে করে মাস্টারি
স্কুল ছেড়ে করতে গেছে মিলিটারির চাকুরী।
কেহ এ. আর. পি-র চাকরী করি কষ্টে করে কালযাপন ॥ (ধুয়া)
শিক্ষকের মাহিনা বৃদ্ধি গরীব ছাত্রের ফ্রী রেশান
পাঠ্য পুস্তক কাগজ কালির শীঘ্র যেন দাম কমান—
এই দাবি পূরণের জন্য মিলি কর আন্দোলন ॥ (ধুয়া)

গোমদণ্ডী, ১৯৪৪

২৯

মরি হায় বাংলাদেশে বসতি বাংলা আমার প্রাণ।
বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার উপাদান
কিরে হৈ হৈয়া
বাংলার আশা বাংলার ভাষা গাহিব বাংলার গান ॥
বাংলার মাঠে নদীর তটে ফলছে সোনার ধান।
দুলছে শ্যামল ঝলমল ঝলমল হেরে জুড়ায় প্রাণ ॥
প্রকৃতির লীলা নিকেতন সোনার বাংলা খান
তাতে মন মাতানো প্রাণ জুড়ানো দোয়েল শ্যামার গান ॥
কিরে হৈ হৈয়া—

ঢেউয়ের তালে হেলে দুলে চলছে নৌকাখান
চলছে বহর বদর বদর মাঝি মাল্লার গান ॥
বাংলা আমার মাতৃভাষা শুনে জুড়ায় প্রাণ
ওমা বাংলাভূমি চরণ চুমি কোলে দিও স্থান ॥
কিরে হৈ হৈয়া—

নয়াপাড়া, ২০ | ৪ | ৪৪

৩০

জাগো ভারত রমণী,
তোমরা জাগিবে যবে, ভারত স্বাধীন হবে
জেগে মা জাগাও সবে শক্তিরূপিণী ॥
পিঞ্জরের পাখীর মত শক্তি থাকতে শক্তিহীন,
পরাধীনা পরাশ্রিতা থাকিবে আর কতদিন।
ইউরোপ, রাশিয়া, চীনে শিক্ষা শিল্পে মেয়েগণে
নারীশক্তি সঞ্চালনে কাঁপাতেছে ধরণী ॥
দেশবাসীর দুঃখ দেখে করবে বলে প্রতিকার
প্রাণ দিল ধলঘাটের প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার
নাইডু কংগ্রেসনেত্রী, ভারতে যার অতুল কীর্তি
সঞ্চারি রমণী শক্তি হও অনুগামিনী ॥
কেহ অন্ন-বস্ত্র দায়ে কেহ বা সমাজের ভয়ে
নিরাশ্রয়া অনিচ্ছাতে, স্থান করে পতিতালয়ে
এদের দুঃস্থ আগারে নিয়া কুটিরশিল্প শিখাইয়া
নারী সমাজ ঝঙ্কারিয়া তোল সবে জননী ॥
মেয়েরা গণ্ডী আবদ্ধ, সমাজের কুসংস্কার
শ্রীপুরের কল্পনা দত্ত ভেঙ্গে করে চুরমার।
মেয়ে কুলে চাঁদসুলতানা, গার্গী, রাবেয়া, মীরা, খনা
তাদের মত বীরাঙ্গনা হয়ে দাঁড়াও এখনি ॥

সমাজ-নিপীড়িত হাড়ি মুচি, জেলে নারীগণ—
তারাও তোমাদের অঙ্গ, ঘৃণা ক'রোনা কখন।
চুম্বকে যেন লোহা টানে সুশিক্ষা দাও কাছে এনে
পূর্ণাঙ্গিনী তারা বিনে হবে না কখনও ॥

৩১

বাংলার কৃষক ভাইগণ, হও রে চেতন
জমিদারের হাতের মুঠায় কৃষকের জীবন ॥
মাথার ঘাম পায়েতে ফেলি জলে ভিজি রোদে জ্বলি,
আট মাস থাকে গোলা খালি, নিত্য অনটন
বন্যায় মারে, পোকায় কাটে, জমিদারে ভাগা লুটে,
রেহাই চাইলে জ্বলি উঠে, আগুনের মতন ॥
শোষণকারী জমিদার, জমিদার নয় 'যম-দুয়ার,'
লাঙল যার জমি তার, কৃষকের এই পণ ॥
হিন্দু মুসলমানে মিলি, একসঙ্গে আওয়াজ তুলি,
জমিদারী যাক চলি, বাঁচিবে জীবন ॥

গোমদণ্ডী, ১৫ | ৭ | ৪৪

৩২

দেশের বন্ধু ভাই, দেশী লোকের প্রাণ রাখ বাঁচাই।
সংকটের উপর সংকট এবার বুঝি রক্ষা নাই ॥
গত সন আষাঢ় শ্রাবণে কি আগুন যে জ্বলেছে,—
দুইলক্ষ নরনারী চট্টগ্রামে মরেছে।
দ্বিগুণ বেগে আবার আগুন ফাগুনে এসেছে ধাই ॥
আউশের জমির চাষ চলে না, চাষা আশা ছেড়েছে—
ঘরে নাই একমুষ্টি বীজ ধান হালের গরু খাই ॥
আর এক সংকট মহামারী বসন্ত আর কলেরায়
ফুলা আর ম্যালেরিয়া যমরাজার ভাণ্ডার পুরায়।
ওষুধ চোরা বাজারে যায় রোগীর ভাগ্যে ঔষধ নাই ॥

এই সংকট সমাধানে হিন্দু মুসলিম চাষীগণ
হালের গরু বীজ ধান পেতে জোরে কর আন্দোলন।
কৃষক সমিতি গড়ে হিন্দু আর মুসলমানে
ঐক্যের পথে এগিয়ে যাও এই সংকট সমাধানে।
জাতীয় সরকার স্থাপনে জাপানে দিব খেদাই ॥

গোমদণ্ডী, ৭ | ১০ | ৪৪

৩৩

মোদের দেশ স্বাধীন করা হলনা, কপালের দুঃখ ঘুচিল না,
নানা রকম টেক্স জারী দিনের পর দিন এই যাতনা।
তার উপর দুর্ভিক্ষ আর মহামারী লাগা আছে থামান যায় না ॥
জমিদারের শোষণ নীতি, নিজের উদর পোষণ হয় না
চাষ ক'রে শক্তি নাশ করি, দুইবেলা আহার জুটে না ॥
কেরোসিন পাই আড়াইপোয়া, কনট্রোল রেইট সাড়ে পাঁচ আনা,
ব্লেকমার্কেট দেড়টাকা সের, আড়াই পোয়ায় কুলায় ত না।
হিন্দু মুসলিম মারামারি দেশে এল কি ঘটনা
যত কুলী মজুর গরীব মরে, নেতারা ত কেউ মরে না ॥
বাঘে ছাগে সাপে ভেকে সম্বন্ধ কি ভেবে চাওনা
গরীব আর বড়লোক দোঁহে সেই সম্বন্ধ ভুল হবে না ॥
দুর্ভিক্ষে তার প্রমাণ আছে আবাল বৃদ্ধ সবের জানা
এক টাকায় তিন পোয়া চৈল, তার বেশী দিতে পারে না ॥
হিন্দু মুসলিম কৃষক মজুর ভেবে দেখ সর্বজনা
কৃষকের কৃষক সমিতি, অন্য আশায় ফল হবে না ॥

গোমদণ্ডী, ১৫ | ৮ | ৪৫

৩৪

হুশিয়ার খুব হুশিয়ার, হুশিয়ার খুব হুশিয়ার—হুশিয়ার।
বিভেদকারী কাছে আসি বন্ধুর ভাব দেখায় ॥
সাম্রাজ্যবাদী গুপ্তচর, শ্রমিক ইউনিয়নে তারা ঘুরে নিরন্তর,
শ্রমিকে শ্রমিকে দ্বন্দ্ব লাগাতে চায় অনিবার ॥
আছে যত শ্রমিক ভাই,
শ্রমিকের দরদী শ্রমিক আর কেহ নাই,
বিভেদ মন্ত্র কানে ঢুকাই, উস্কানি দেয় বারংবার ॥
যদি বাঙালী শ্রমিক পায়,
অবাঙালী শ্রমিকেরে দুশমন বলি গায়,
আবার অবাঙালী শ্রমিক পাইলে, বাঙালীরে কয় দুশমন তার ॥
দেশবাসী হিন্দু মুসলমান,
এই দুশমন হইতে সবে থেক সাবধান,
তারা সুযোগ পাইলে তলে তলে বসাইব দাংগার বাজার ॥
শ্রমিক গোষ্ঠী শ্রমিকের ভাই,
বাঙালী আর অবাঙালী কোন প্রশ্ন নাই,
প্রাণ দিয়ে সংগঠন বাড়াই, চল ঝাণ্ডা উড়াই একতার ॥

৩৫

তোঁয়ারা (তোমরা) হুন্যনি (শুনেছকি) ভাই হুন্যনি খোশ খবর খান হুন্যনি
জইনর (জমির) মালিক চাষা হইব খবর পাইয়্যনি (পেয়েছ কি)।
জঁইদারে (জমিদারে) শোষণ করি চাষীর পরাণ রাখ্যেনি
এক বছর নয় দুই বছর নয় দুইশত বছর গেল,
সাদা চামড়া ধ্বংস করি নিল চাষীর তেল
আঁয়ারার (আমাদের) দুঃখে দুঃখে এই জনম গেল
বুঝালে কেহ বুঝেনি।
হালর বলদ বীজধান লাঙ্গল হক্কলিন (সবকিছু) চাষার
ভাগা নিল জঁইদারে, জইনত ন দে (দেয় না) সার

হেতার লাই (সেই জন্য) জইন রুঠা (অনুর্বর) হৈযার (হয়ে যাচ্ছে)
খাজনা মাপ দিল নি ॥
চৈতর (চৈত্রের) পর বৈশাখ আইলে নোয়া (নতুন) বছর হয় (হয়ে থাকে)
জ'ইদারে জইন্ ন দিব চাষারে লাগার ডর,
অহন ফুশ্যাই ফুশ্যাই (ফুসলিয়ে ফুসলিয়ে) কবুলিয়ত লয় (নিচ্ছে)
বাড়ি ভিটা রাইখ্ব নি
শোন যত চাষী ভাই, লাঙ্গল যার জইন তার, আর কন (কোন)
কথা নাই ।
জান দিয়ম্ (দেব) জইন্ ন ছারগ্যাম (ছাড়ব না)
কইরলে করুক কোরবাণী ॥

৩৬

ওঠ জাগো কৃষক ভাই থেকোনা ঘুমে ।
বীর সন্তান যত আছ তোমরা ভারত ভুমে ॥
পরাধীনা পরাশ্রিতা জননী আমার ।
তোল রক্ত পতাকা সকলে করিয়া হুঙ্কার ।
শৃঙ্খল টুক্‌রো টুক্‌রো কর সিংহ বিক্রমে ॥
দেশে, কৃষক মজুর আজি সকলে মিলো ।
ছাই চাপা আগুন আবার জ্বালো জ্বালো,
ধ্বংস কর যত শোষণ জুলুমে ॥
কারাবরণ করেছ কত কত অনশন
ভাঙ্গব, চল্লিশ কোটির পদাঘাতে বিদেশীর শাসন,
ভ্রাতৃ প্রেমেতে মিলে হিন্দু মুসলিমে ॥

গোমদণ্ডী, ১০ | ১০ | ৪৬

৩৭

এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল,
মুক্তি যুদ্ধের বীর সেনা মোরা, মুছাব মায়ের নয়ন জল ।
এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল ।

বাজে বিজয় ভেরী গগন বিদারি কিসের শঙ্কা কিসের ভয়,
মুক্ত কণ্ঠে গাহিব মোরা জয় পাকিস্তানের জয়,
আমরা আনিব বিশ্বশান্তি, আমরা ঘুচাব বিভেদ ভ্রান্তি
আমরা গড়িব নতুন দুনিয়া মিলে যত তরুণ দল ॥
প্রগতির তালে চলিব পা ফেলে, প্রতিক্রিয়ার হবে রুদ্ধশ্বাস
বিভেদের মূল সমূলে উৎপাটি, দৈন্য অরাতি করিব নাশ
পূর্ব আকাশে নবারুণ, গণ সিংহনাদ ছাড়িছে শুন,
অরুণ বেগে আয় রে তরুণ, সঞ্চারিয়া দেহে নবীন বল।
প্রতিঘরে দীপালি জ্বালিব, পুলকে পূর্ণিত সবার প্রাণ।
সর্বহারা দল মিলিয়া গাহিবে সুমধুর সুরে শান্তির গান
বীর পদভরে কাঁপিবে মেদিনী, দিগন্ত ব্যাপিয়া উঠুক জয়ধ্বনি
আয় ছুটে আয় তরুণ তরুণী, ভীরুতা ক্লান্তি চরণে দল ॥

গোমদণ্ডী, ৩ | ১০ | ৪৭

৩৮

শান্তির পতাকা ঐ উড়ছে, দিকে দিকে জনগণ জাগছে।
পথে প্রান্তরে, কৃষক মজুরের ঘরে, আশার মশাল আবার জ্বলছে ॥
দৈন্য দুর্নীতি অবসান, মুখরিত মজদুর কিষাণ,
গণ দুশমনের দল কাঁপছে, নয়া জামানা হাসছে,
শান্তির আগমনী ঘোষণা ক'রে কপোত ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে ॥
শান্তির দামামা মধুর, প্রভাতিয়া সুললিত সুর,
নবারুণ পূব আকাশে উঠছে, তরুণ তরুণীরা ছুটছে
প্রগতির প্রেরণায় উদ্বেল হয়ে, কাতারে কাতারে তারা চলছে।
আজ সবাকার প্রফুল্লিত প্রাণ, কণ্ঠে কণ্ঠে শান্তির গান,
ঘোর ঘন ঘটা কাটছে, জয় জয় জয়ঢাক বাজছে,
শান্তির নিশান হাতে অসংখ্য নরনারী
রাজপথে দলে দলে নামছে ॥

কলিকাতা, ১০ | ১১ | ৪৭

৩৯

পাকিস্তানের ঐতিহ্য কি শুন বন্ধুগণ,
সব কাজে অগ্রণী মোরা আছি সর্বক্ষণ রে
মাস্টার কাজেম আলী, সেনগুপ্ত, জন্মভূমি করিতে মুক্ত
আত্মত্যাগী দেশভক্ত এমন আর কয়জন রে।
সূর্য সেন বিপ্লবী বীরে অস্ত্রহাতে যুদ্ধ করে
জালালাবাদ পাহাড়ে আর অস্ত্রাগার লুণ্ঠন রে
বোস্তানের বাদশা বায়জীদে চট্টগ্রাম আস্তানা পাতে,
শেখ ফরিদ, আমানত আদি যত পীর বুজর্গ গণ রে
চট্টগ্রামের নাবিকেরা পৃথিবীর নাবিকের সেরা
যুদ্ধ দিনে রণতরী করেছে চালনা রে
পাকিস্তানের আর কি ভয়, চা, সুপারী, তামাক হয়,
সুতা জন্মে পাহাড়ময়, মিলিবে বসন রে।
পতিত জমি আবাদ হলে অন্ন কষ্ট যাবে চলে
হিন্দু মুসলিম সবে কর আয়োজন রে ॥

১৯৪৮-১৯৬৪

৪০

আর কত দিন ঘরের কোণে রই
আর কত দিন ঘরের কোণে রই।
নারী কুলে জন্ম নিয়ে আমরা বুঝি মানুষ নই ॥
মেয়েদের সমান অধিকার শুনলাম আইন হয়েছে পাস।
তবু কেন দাসীপনা রয়ে গেল বার মাস।
নিপীড়ন নির্যাতন নারী কুলে যত সই ॥
রাশিয়া, চীন, জাপান, জার্মান দেশে যত মেয়েরায়
পুরুষ হতে অধিক সাহস, রাইফেল নিয়ে যুদ্ধে যায়।

আমরা কেন চুলার দরজায় অঙ্গের কাপড় ঢাকা রই।
সভ্য শিক্ষিত দেশের দেখি যত রমণী
ইঞ্জিন এরোপ্লেন চালায়, শিল্পে অগ্রণী।
দিন যামিনী দাসীপনা এলেম কি কপালে লই ॥
আমীর ওম্‌রার মেয়ে যত, সভা সমিতিতে যায়,
গরীবের রমণী গেলে বেপর্দাটি প্রকাশ পায়।
কয়েদীর মত জেল খানায়, কবে জানি মুক্ত হই ॥
টেলিগ্রাফ, পোস্ট অফিসে কিংবা স্টেশনে মাস্টার,
মেয়েরা চাকুরী পেলে বাঁচত কত পরিবার।
অসময়ে টাকার দরকার, দেশের মানুষ বুঝে কই ॥

পটিয়া, ১৩ | ৭ | ৪৮

৪১

বাজল শান্তির ভেরী
বাজল শান্তির ভেরী
দিকে দিকে পড়ছে সাড়া, ছুটছে যুবক সারি সারি।
বিশ লাখ ছাত্র যুবকে, দাঁড়ায় বার্লিনের বুকে
রুখিতে যুদ্ধ দানবে গিয়েছে অগ্রসরি।
শান্তির ডাকে দিচ্ছে সাড়া বিশ্বের নরনারী,
তারা কদম কদম এগিয়ে যায়, শ্বেত কপোতের ঝাণ্ডা ধরি।
শান্তির তুর্যনাদ শুনি, মনেতে শঙ্কা গনি
সাম্রাজ্যবাদীর দল উঠেছে শিহরি।
মানবধ্বংসী যুদ্ধদানব কাঁপে থর থর করি।
হবে শান্তি স্থাপন, করেছে পণ সগর্বে জুলিও কুরি ॥
মানুষে মানুষে প্রীতি, এ হল শান্তির নীতি,
সহ অবস্থানের রীতি চায় বিশ্ব জুড়ি।
নর-রক্ত লোলুপ দৈত্য দিতে ধ্বংস করি,

শান্তিকামী বেঁধেছে জোট হাতে হাতে ধরি।
শান্তির শিবির উঠবে গড়ে আর বেশী নাই রে দেরি।

কলিকাতা, ৭ | ১১ | ৪৮

৪২

পাকিস্তানের হিন্দু মুসলিম হও ভাই হুঁশিয়ার
গরীব মারা কল বসাইল দেশের যত মজুতদার
ভাই দেশের যত মজুতদার।
বছর বছর দুর্ভিক্ষ আসে,
লক্ষ ভাই বোন মোদের পরাণে নাশে,
মজুতদার আনন্দে ভাসে, নোটের বাক্স পুরা তার।
মোদের সুখী পাকিস্তান
দুঃখের সৃষ্টি কে করিল, কর অনুমান।
সহসা কর তার বিধান, নইলে জীবন বাঁচা ভার।
শুন যত বন্ধু ভাই,
জমিদারী উচ্ছেদ বিনা দেশের মঙ্গল নাই।
কর পাকিস্তানের শত্রু ধ্বংস, বংশনাশা মজুতদার।

গোমদণ্ডী, ১০ | ১১ | ৪৮

৪৩

দেশের ভাই বোন রে কত নিদ্রা যাও
মাল কোঠাতে চোর ঢুকেছে নয়ন মেলে চাও॥
একটি একটি করে ঘরে নিল সকল মাল
জানি শুনি নাক ডাকিয়ে ঘুমাবে কতকাল॥
গোলাভরা ধান ছিল ভাই পুকুর ভরা মাছ
গোয়াল ভরা গাই ছিল ভাই কিছু ত নাই আজ॥

গাছের সুপারি নিল তামাক হল চুরি
কল্কিতে আগুন উঠে না হুক্কার গড়াগড়ি ॥
বৌয়ে কয় কাপড় আন পোলায় কয় ভাত
স্বাধীন হলাম তবু কেন এ দারুণ উৎপাত ॥
সোনার বাংলায় সোনার ধান ফলাইত চাষী
দুনিয়ার খোরাক যোগায় যে সে আজ উপবাসী ॥
মৌলিক গণতন্ত্র পাইয়া হইয়া গেলাম খুশি
বড়লোকে খায় রসগোল্লা গরীবে খায় ঘুঁষি ॥
ব্রিটিশ এত রক্তমাংস শোষিয়া নিয়েছে
এখন আবার দেশী শোষক জাঁকিয়া বসেছে ॥
এই ধ্বংসের মূলেতে কি যদি টের পাও
গরীব একজোট হয়ে ভাগ্য বদল ক'রে নাও ॥

৪৪

দেশের ভাইরে স্বাধীন দেশের হাল চাল কিছু বুঝ নি।
দিন চলে না আয়ু চলে হিসাব কিতাব পাইছ নি।
লঙ্কা লবণ ডাইলে তেলে, দামে যেমন আগুন জ্বলে,
মাঝে মাঝে বাজারে উধাও চিনি।
রোগী করে গড়াগড়ি, ঔষধ পায় কালো বাজারী
এই নীতি দুনিয়া জুড়ি বাপ দাদায় কেহ দেখছ নি ॥
স্বাধীন দেশের হাল…
মজদুর ভাই দিনে যাহা পায়, দিনের খরচ না কুলায়,
আধপেটা খাই দিনের পর দিন বলহানি।
এই অভাবকে কেন্দ্র করে ভাইয়ে ভাইয়ে পৃথক করে
দায়ী কে তার ভিতরে ভাবি চিন্তি চাইয়নি ॥
সাদা শোষক চলে গেছে, এখনও তার বীজ আছে
ব্যাঙ্কে মিলে চা বাগানে চিন নি।
তোমায় আমায় পৃথক করতে, চেষ্টা তাদের দিনে রাতে
হুঁশে চল এক যোগেতে, দেশ পাগলের শেষ বাণী ॥

৪৫

মিলে মিশে এক সাথে সব চল, ওরে চাষীর দল।
সোনার মাঠে ঝলমল করে নূতন মেঘের জল।
মোদের ঘামে পয়দা করি সোনার ফসল রে ॥
হৈ হৈ হৈ হৈ হৈ হৈ হৈ
আমার খুনে আজকে যারা দেশে বড় লোক,
বাঁচি মরি চায় না, তারা সদাই শোষণ জোঁক রে
যারা বড় লোক—
ছুটে এস দরদী ভাই যত চাষীর দল,
বহু দিনের সখ স্বপ্ন করিব সফল রে ॥
হৈ হৈ হৈ হৈ হৈ হৈ হৈ…
মোদের রক্তে ফসল ফলাই ; পরের গোলা ভরে
মোরা খাই কি না খাই আছি কি নাই, জিজ্ঞাসা কে করে রে
আধ পেটা খাই লাঙল চালাই, শরীরে নাই বল,
মাথা তোল, ছিঁড়ে ফেল পুরান শৃঙ্খল রে ॥
হিন্দু মুসলিম চাষী মোরা একযোগ যদি হই,
পর্বত উপাড়ি ফেলতে বেশী দেরি কই রে।
মোদের অনৈক্য দেখে তাদের বাড়ে বল
শোষক দলে খর্ব কর, মিলি চাষীর দল রে ॥

গোমদণ্ডী, ১২।৫।৫০

৪৬

দেশর হালচাল কিছু বুঝ্যানি
এবার গরীব ভিটা ছাড়া ঠায়র পাইয় নি (বুঝতে পেরেছ কি)
ভোটে ভোটে জান ফতে হয় গরীব কি পায় কি জানি
ইউনিয়নে ভোট দিবা, রেশন আইনত্ গেলে ঘেড্ ঘেডি খাইবা (ধমক খাবে)
খুশি মুখে বাড়ি যাইবা, তবু গরীব বুঝে নি।

তারপর ডিষ্ট্রিক বোর্ডে ভোট দাও যাই
মেম্বারের ঘাটায় রাস্তা বড় তোঁয়ার আঁয়ার (তোমার আমার) রাস্তা নাই,
হাডন ন যায় (হাঁটা যায় না) ফুট পানির লাই (জল কাদার জন্য)
রানর (উরুর) কায়র (কাপড়) তুলবা নি।
আইন সভার ভোট দিবা ভাতকায়রর কথা কইলে
বড় ডেকর (জেলখানার বড় ভাতের হাঁড়ি) ভাত খাইবা।
লম্বা ঘরে (জেলে কয়েদীদের লম্বা ঘর) বাসা পাইবা, কম্বলত্ ঘুম যাইবা নি।
সাড়ে চার কোটি আর আড়াই কোটি ভাই
তুমি বাঁচ আমি বাঁচি, চল হোয়ান (সমান) খাই
তোঁয়ার চাইর তালা (চার তলা বাড়ি) আঁয়ারত ঘর নাই, হেই বিচার চলে নি।
তোঁয়ার ভোটে এম এল এ মন্ত্রী হয়
আইন সভাতে যাই গরীবের কথা তারা নি কিছু কয়,
গরীবের লাই (জন্য) ছোয়াল (সওয়াল) করি দোষী হইয়ে ভাসানী।

গোমদণ্ডী, ৪ | ৯ | ৫০

৪৭

ভাইরে গরীব গুণ্যার (গরীবদের) কোয়াল (কপাল) খাইয়ে
রাড়ে (দুর্ভিক্ষ) মানুষ হাডত (হাটে) ন যায় (যায় না) পৈসা হারাইয়ে।
গরু ছাগল, হাণ্ডি-বাসন হুক্কলিন ত বেচি খাইয়ে।
অ ভাই তেল্যা মাথাত তেল, দেশের এত জিনিস পত্তর বুঝ কডে (কোথায়) গেল
কাপড়-চোপড় তেল, মরিচের দাম যাই (গিয়ে) আছমান ছুঁইয়ে।
হাত-পুরুষ্যা (সাত পুরুষের) মাল,
একখান একখান বেচি খাইয়ে দা-কুড়াল কোদাল,
বাড়ির গাছ গাছলি বেচি এবার ভিখ মাগন শুরু লইয়ে।
মানুষ উয়াসে (উপবাসে) গড়ায়,
মার্কিন থুন (মার্কিনের থেকে) কিনা চৈল হিন্দুস্তান কেয়েনে যায়,
ব্লেক মার্কেটিং করি বহুত মাইন্ষর পেট মোটা হইয়ে,

মোটা ভাত মোটা কায়র (কাপড়) দিত কইল,
গরীব গুণ্যার ভোট পাই তারা মন্ত্রীত হৈল,
দেশের মানুষ উয়াস্তা রইল, আজ তারা কডে (কোথায়) গেইয়ে।

চট্টগ্রাম, ১৩ | ২ | ৫১

৪৮

আঁয়ার এই ঘরবাড়ি কারে দিতাম।
আঁয়ারে কন ভূতে পাইয়ে হিন্দুস্তান যাইতাম।
কিল্যাই লোভত পড়ি বছর ভরি দুঃখর বারমাস গাইতাম।
ঘরত দুয়া দুধাল গাই, উগ্যার দুধে খরছ চলে আর উগ্যার দুধ খাই,
মাইন্ষর কথা ধরি হিন্দুস্তান যাই, হেডে আঁই কি খাইতাম॥
আছে ক্ষেতত তরকারি, পইর ভরা মাছ আছে ভাই সুখে খাইত পারি,
কিল্যাই আটার রুটি জাউ খিচুরি খাইয়ারে জান হারাতাম॥
যারা হিন্দুস্তান গেইয়ে, বহুত বিনা দোষে আসামী হই আসামত রইয়ে,
আঁয়ার কান্ধত কি ভূত শোয়ার হইয়ে, জন্মস্থান ফেলাই ধাইতাম॥
দুঃখ কারে বুঝাইয়ম, হৈল বোয়াল ধার দারিকা পুঁটি তার হংগে যাইয়ম,
আঁয়ার মা বাপর চিতানি পাইয়ম মোমের বাত্তি জ্বালাইতাম॥
সুখ দুখ ছাড়াত দেশ নাই হক্কল দেশত করন পরে বাঁচিবার লড়াই,
দেশত্যা ভাই বন্ধু ফেলাই কিল্যাই রিপুজি হইতাম॥

গোমদণ্ডী, ১১ | ৫ | ৫২

৪৯

শুন ও বাঙালী ভাই বোনরে, হিন্দু মুসলমানরে ভাই
এক দেশেতে বসতি মোদের এক মায়ের সন্তান রে॥
(ও বাঙালী ভাই-বোনরে) হাজার হাজার বছর হতে মোদের মেশামেশি
আমায় দেখলে তোমার মুখে ফুটে উঠে হাসি রে॥

(ঐ) তুমি আমি একযোগ হলে অসাধ্য সাধন।
বনের সিংহ ধরে আনতে লাগে কতক্ষণ রে ॥
(ঐ) তোমার আলোকে আমি আলোকিত হই।
আকাশে নক্ষত্রের মত পাশাপাশি রই রে ॥
(ঐ) রাত্র প্রভাত হলে তোমার আমার দেখা দেখি।
দাদা মামা চাচা জেঠা কত ডাকাডাকি রে ॥
(ঐ) হিন্দু ঘরে আগুন লাগলে মুসলিম ঢালে পানি।
মুসলিম ছেলে জলে পড়লে হিন্দু তোলে টানি রে ॥
(ঐ) তোমার আমার বিচ্ছেদ আনতে বিদেশীর দালালে।
বিভেদ মন্ত্র কানে দিয়া উল্টা চাল চালে রে ॥
(ঐ) তাদের হতে হুঁশে থেক শুন ভাইসকল।
তোমার আমার একতায় দেশের হবে মঙ্গল রে ॥

গোমদণ্ডী, ১২ | ৮ | ৫২

৫০

ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি আর কয়দিন চলিবে বল
সাম্রাজ্যবাদীর ফাঁদেতে পা দিয়ে সর্বনাশ হল।
একতাতে স্বাধীন রবে, বিবাদে গোলামী পাবে,
বিচার করে দেখুন সবে এই দুইটিতে কোন্‌টি ভাল।
আজ শত্রু ভাবি যারে, কাল সে বন্ধু হতে পারে,
স্বাধীনতা কাহার তরে মানুষ যদি না রহিল ॥
লুঠতরাজ, হত্যা, অত্যাচার এক একটা জঘন্য ব্যাপার
সুনাম নষ্ট নিন্দার কারবার চাটগাঁ হতে মুছে ফেল।
বেচা কিনা হাট বাজারে কে কারে ছাড়িয়ে পারে
অনর্থক এই বিবাদ ক'রে দেশের যে অমঙ্গল হল ॥
শহীদের ইমারত তুলে, কারাবাসের ফাঁসে ঝুলে
গুলির মুখে রক্ত দিলে কি জন্যে ভাই বুঝে চল।
রমেশ পাগলের পাগলা কথা ঐক্য ছাড়া স্বাধীনতা
পাষাণে ভাঙ্গিলে মাথা কে ঠেকাবে ভাই বল বল ॥

৫১

ভুল বুঝে মূল হারাইও না, শুন বন্ধুগণ।
আবার ভুল করিলে, হবে সর্বনাশ সাধন ॥
হিন্দু মুসলিম দুই ভাই কেহ ছাড়া কেহ নাই।
বিভেদকারী ঘটায় দেশে যত অঘটন ॥
মুছে নাইতো প্রাণের দাগ, পাঞ্জাব জালিয়ানওয়ালাবাগ।
ভুলেছ কি তুরস্কের খেলাফত আন্দোলন।
ভুলেছ কি আছে মনে বোম্বে নৌবিদ্রোহীগণ।
ভুলেছ কি আজাদ হিন্দ ফৌজ মুক্তি বিবরণ ॥
ভুলেছ কি কহ কহ কসাই পাড়া যে দিন দাহ,
রুখিয়া দাঁড়াল চাটগার হিন্দু মুসলিমগণ ॥
দেখতে দেখতে ভুলে গেলে, সেই দিন ত রক্ত দিলে,
ছাত্র-জনতা কেপটেন রসীদ আলী মুক্ত করিবার কারণ ॥
ভুলেছ কি সেই কথাটি, ছাত্র রক্তে ভিজে মাটি,
কদম রসুল রামেশ্বরের যেদিন শাহাদত বরণ ॥
মিলনে শান্তি পাবে, বিবাদে উৎসন্ন যাবে
মিলন বিনে কোন কর্ম হবে না সাধন।

৫২

মোদের বুঝতে নাই আর বাকী
মজুতদারে দেশ মজাইল গরীবেরে দিয়ে ফাঁকি ॥
দেশেতে মজুতদার যারা দেশ-নাশক শোষক তারা
মালের দর করে চড়া বসে আছে দেখি,
এই আনার মাল ষোল আনা লইলে আর বিকায় কি।
এক টাকার দুই আনা বাট্টা এদেশেতে কেমনে থাকি ॥
আট আনার দিন মজুরী পেটের দায়ে ধনীর বাড়ি
মাটি কাটি লাকড়ি চিরি অন্নদায়ে ঠেকি,
সন্ধ্যাবেলা ঘরে আসতে মাইনে খুঁজে দেখি।

ধনী কয়, নাই ভাঙ্গা পয়সা, আজ না দিলে হয় নাকি ?
জিলা কর্তা মেজিষ্টরে
দেশ রক্ষার আশা করে
মালের দর লিষ্টি ক'রে নিজে দিল লিখি
লঙ্কা লবণ, চাউল কেরোসিন, এই দরে হউক বিকি ।
ধনী কয়, দর বাঁধা মাল ছুট হয়েছে এসব আমরা বেচি নাকি ॥
আমন ধান খরিদ করে রেখেছে গোলা ভরে
বন্ধুবান্ধব মারা যাবে উপবাস থাকি,
চল, হিন্দু মুসলিম সবাই মিলে বেফাঁস করি এই চালাকি ॥

৫৩

একটু পাগলের বাণী শুন রে বন্ধুগণ
একটু পাগলের বাণী শুন (ধুয়া)
আমার জন্য থাকলে তুমি
তোমার হিতে আছি আমি
নিজের স্বার্থ করি হাছিল, ভুল কেন অন্য রে ॥
বাতি জ্বলে আমার ঘরে
ভাই রয়েছে ঘোর আঁধারে
এই বিধানটি কোন্ বিচারে সুখের বলে মান রে
সবের হলে সুখ সুবিধা
তাতে কার কি অসুবিধা
সমান সুখে মনে দ্বিধা হতেছে আজ কেন রে
শুন নাই রাশিয়ার নীতি
কৃষক মজুরের প্রগতি
ভেদ নীতিতে হয় দুর্গতি, এই কথাটি জান রে
হিন্দু মুসলমান মিশে
বসতি করিব দেশে
অনৈক্য মমতা নাশে মনে মনে গণ রে ॥

৫৪

একি চমৎকার, দেশে এল ফাঁক তালের কারবার,
গরীব মারা কল বসেছে, হুঁশিয়ার ভাই হুঁশিয়ার ॥
গরীবের খোশামোদ করে যখন আসে ভোটের কাল,
ভোট ফুরালে মেম্বার হলে তখন তাদের চক্ষু লাল।
গরীবের যে ভাঙ্গা কপাল গরীব ত বুঝে না আর ॥
আমরা সকল গরীবের দল, নিজের দোষে কষ্ট পাই,
যারে তারে ভোট দিয়েছি চা'র পানি আর বিড়ি খাই।
মানুষ চিনি ভোট দিতাম ভাই হইত না এই অত্যাচার ॥
ভোট দিয়া মেম্বার করছি সুখ সুবিধার কারণে
ছিঁড়া গিরা দিয়া পরে মোদের মা বোনে।
ফাইন শাড়ী মেম্বারে নেয়, ভোট দিয়া এই পুরস্কার
আইন সভায় গরীব পাঠাও, ধনীর আশা কর না
মনে রেখ সর্বজনে ভাত কাপড়ের যন্ত্রণা
এক বৃষ্টিতে বর্ষা যায় না, সামনে ভোট হবে আবার ॥

গোমদণ্ডী, ১১ | ৩ | ৫৩

৫৫

একুশে ফেব্রুয়ারী আবার দেখি ফিরে এল।
এই দিনে রমনার মাঠে ছাত্ররক্তে ঢেউ খেলিল
উর্দু রাষ্ট্রভাষা শুনে ঢাকার যত ছাত্রগণে,
বাংলা ভাষা আন্দোলনে, রাজপথে নামিয়ে এল।
সামনে পুলিশ হল বাদী, ছাত্র দাঁড়াল খেদি
মুহুর্মুহু গগন ভেদি শ্লোগান শুরু হল।
পুলিশ জুলুম বন্ধ কর, নূরুল আমিন গদি ছাড়
রাষ্ট্রভাষা বাংলা কর, হুংকারে ধরা কাঁপিল।
টিয়ারগ্যাস আর লাঠি পিটে, সঙ্গে সঙ্গে গুলী ছুটে।

ছাত্ররা পিছু না হটে, বুক পেতে দাঁড়ায়ে রইল,
ইংগিত দিয়া বাঙালীরে, বাংলা ভাষা রাখিবারে,
রক্ত দিয়া রাস্তা 'পরে, শহীদ স্বাক্ষর রেখে গেল।
দুঃখের কথা কারে বলি বাংলা ভাষা গেলে চলি
সাড়ে চার কোটি বাঙালীর আত্মহত্যা করাই ভাল।

গোমদণ্ডী, ১৫ | ৩ | ৫৩

৫৬

ভাষার জন্য জীবন হারালি
বাঙালী ভাইরে রমনার মাটি রক্তে ভাসালি।
(বাঙালী ভাইরে) বাঙালীদের বাংলা ভাষা জীবনে মরণে।
মুখের ভাষা না থাকিলে জীবন রাখি কেনে ॥
(ও বাঙালী ভাইরে) কীট পতঙ্গ পশু পাখীর স্বীয় ভাষার বুলি।
তা হইতে কি অধম হলাম অভাগা বাঙালী ॥
(ও) সূর্য উঠে লাল হয়ে ভাই পূরব গগনে।
তোমাদের লাল খুনের কথা উঠে মোদের মনে ॥
সাড়ে চার কোটি বাঙালী পূর্ববঙ্গে আছে।
তোরা বুকে গুলী নিলি তারা কেমনে বাঁচে ॥
ধমনীতে রক্তবিন্দু থাকে যতক্ষণ
রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্য জীবন মরণ পণ
একজনও বাঙালী যদি থাকিব বাঁচিয়া
যদ্দিন বাঁচি তদ্দিন আছি ভাষার দাবি নিয়া ॥
বঙ্গবীর শফি, বরকত, জব্বার সালাম।
কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে তোমাদের সুনাম ॥
ঐতিহাসিক দিবস এই একুশে ফেব্রুয়ারী।
দিবে শহীদ স্তম্ভে পুষ্পমাল্য বাংলার নরনারী।

গোমদণ্ডী, ১৩ | ৫ | ৫৩

৫৭

ভাইরে আর না যুদ্ধ আর না
টের পেয়েছি, টের পেয়েছি, একসাথে ঝাঁপিয়ে পড় না ॥
যারা কাড়ে মুখের গ্রাস, তাদের পুরান অভ্যাস
ঐ সব যমের পেয়াদা শোষে জেয়াদা শোষক সঙ্গ ছাড় না ॥
ভাইসব, তারাই ত আন্‌ল আকাল,
সতী হারাল পতি কত মা হারাল ছাওয়াল।
নিজের ভিটা মাটি ছাড়ি কত করল দেশান্তরী
নোট নিল থলে ভরি, একটু নজর কর না ॥
ঐ সব যুদ্ধবাজের দলে,
খুন চোষা জলৌকা মশা এক সাথে সব চলে।
নররক্তের চাই না বান, এটম বম্বের অভিযান
মিলে হিন্দু মুসলমান জোরসে আওয়াজ তুল না ॥

গোমদণ্ডী, ১০।১০।৫৩

৫৮

গরীবের দুঃখের কথা কার কাছে জানাব বল।
স্বাধীনতা পেলাম বটে, কানে শুনা সার হইল
গরীব উপবাসে মরে, কে কারে জিজ্ঞাসা করে।
স্বাধীনতা কাহার তরে মানুষ যদি না রহিল।
সুখের আশে তাড়াতাড়ি, ভোট দিয়ে মেম্বার করি,
মেম্বার দিল গলায় দড়ি রিলিফে সব প্রমাণ হইল।
ভোটের বেলা কাকা জেঠা, ভোট ফুরালে দূর হ বেটা,
তবু এই সব বুঝতে লেঠা দেশের মানুষ কি হইল।
হিন্দু মুসলিম মনে প্রাণে, এক হয়ে যাও দেশ গঠনে
দেশের উন্নতির কারণে, স্থির বুদ্ধিতে বুঝে চল ॥

৫৯

শুন শুন দেশের ভাই বোনরে, বন্যা এল দেশে।
হিন্দু মুসলিম নরনারী মরে উপবাসে রে ॥
(দেশের ভাই বোন রে) ভোট দিয়া মেম্বার বানাইলাম উপকারের তরে।
যার ভোটে মেম্বার হল, তারে ধরি মারে রে ॥
গভর্ণমেণ্ট রিলিফ দিল গরীব বাঁচিবারে।
কার রিজিক নি কনে খাইল সাক্ষী করি কারে রে ॥
ভোটের সময় গরীবের তোয়াজ করে যাই।
ঘাট পার হলে বুর্গ্যা দাদার কথা মনে নাই রে ॥
গরু মরে, ঘর পড়ি গেল বীজ ধানের টাকা চাই
কয়, কেটেল লোন চেটেল হল, আর ত টাকা নাই রে ॥
বারে বারে এই যন্ত্রণা ভোগ করে আসিলাম
আজ যদি হুঁশিয়ার নই কেমন মানুষ হলাম রে ॥

৬০

ভোট দিবা কারে তোমরা ভোট দিবা ভাই কারে
ভোটের জ্বালায় অস্থির হইলাম টিকতে নারি ঘরে।
যদি কাপড় আনতে যাই দুঃখের সীমা সংখ্যা নাই
হুজুরে মজুরের মত দাঁড়াই করজোড়ে।
ফুড কমিটিতে যায়, ইউনিয়ন বোর্ডেও দাঁড়ায়
এক জনেরে তিন চার জায়গায় ভোট দি কেমন করে।
যদি ঘর ডাকাতি হয়, তাদের সুযোগ অতিশয়
ভোট দিতে যে নারাজী রয়, ধরিয়া দিবে তারে।
ভাই বলতে কি সরম, আগে কথা কয় নরম,
ভোট পেলে হয় মহাগরম, যেতে নারি ধারে।
শুন হিন্দু মুসলমান, রাখ কৃষকের পরাণ,
কৃষকের দরদী পেলে ভোট দিও ভাই তারে।

৬১

হুন্তনিরে গণ্যার বাপ ভোট দিবার লাই কই (বলে) পাঠাইছে
ভোট হবে ভোট দিতে যাইও, একথা কই ঢোল পিটাইছে ॥
আমার ভোটে মেম্বার হইয়া, আমার রক্ত চুষি খায়,
হক ইনচাপে কও ত দাদা তারে নি ভোট দেওয়া যায় ॥
ভোট দিয়েছি বারে বারে আমার কি উপকার করে
আর একবার ভোট দিতাম তারে, মোরে নি পাগলে পাইছে।
ভোটের সময় হলে, ভাইরে, গরীবের গায় হাত বুলায়
তারপর গরীব মরে বাঁচে মিঞায় নি আর ফিরে চায়।
গাড়ি করি যেতে ভাই সালাম আল্‌কি দিয়া চাই
মিঞার মুখে হাসিত নাই, বোধ করি কি অসুখ আছে ॥
আইন সভার মেম্বার হল, শোন আর এক খোশ খবর।
তিন বৎসর পর উঠ্যা গেছে, পাক্কা এক দোতালা ঘর ॥
দরেয়াব কর রে ভাই এত টাকা কোথায় পায়
বিজলী বাতি পর্দা টেবিল রেডিও মোটর এনেছে।
এবার শুনি কমিউনিস্ট মেম্বার হতে এল ভাই,
ভেবে চাইবা তারা বিনে গরীবের আর বন্ধু নাই।
জেল ফাঁসির নাইরে ভয় তারাই ত হক্ কথা কয়
তারা যদি মেম্বার হয় গরীব গুস্থার পরাণ বাঁচে ॥

৬২

আমাদের সমাজনীতি দেখে প্রাণে জাগে ভীতি,
মন প্রাণে বড় দুঃখ পাই।
গরীব ঘরে জন্মে যারা, নিজেকে ধিক্কার দেয় তারা,
জগতে গরীবের বন্ধু নাই ॥
কোন বাড়ি নিমন্ত্রণে, গরীব যায় খুশী মনে,
পেট ভরে দুই মুঠো ভাত খাবে।

বড়লোক বসে খেতে, বড় টুকরা পড়ে পাতে,
মিষ্টান্ন একবাটি বেশী পাবে ॥
ঘরে যার ভাল অবস্থা, বাহিরেও সে ব্যবস্থা,
সকল জায়গায় খাতির কদর পায় ।
ঘরে যার খেতে নাই, খেতে চায় পরের বাড়ি যাই,
দুঃখের কপাল দুঃখে যায় ॥
ঘরে চোর ঢুকে, কি আগুন লাগে, গরীব দৌড় মারে আগে,
বড়লোক বিছানায় গড়ায় ।
আরও জিজ্ঞেস করে চাকরে এত সোর গোল কেবা করে
ঘুমান যায় না বেটাদের জ্বালায় ॥
এত সম্মান করে যারে, ছালামে আর নমস্কারে,
তার প্রতিদান মন্দ নয় ।
খাজনা যখন পড়ে বাকী, বাড়ি ভিটা নিলামে ডাকি
জমিদারে খরিদ করে লয় ॥

গোমদণ্ডী, ১০ | ৩ | ৫৪

৬৩

কুলাল পাড়ার মেয়ে আমি শুন মোর দুঃখের কাহিনী
আমার মত এ দেশেতে আর কে আছে অভাগিনী ॥
মিলিটারী নিয়া গেল বাড়ি, ছেলে মেয়ে দুজন আরও অন্ধ শাশুড়ী
স্বামী সহ দেশান্তরী, হলেম পথের কাঙালিনী ॥
স্বামীর হল ম্যালেরিয়া জ্বর, চলৎশক্তি রহিত কে আর লইবে খবর
আমি হোটেলে বাট্‌না বাটি, খাটি মরি দিন যামিনী ॥
হোটেলে এক জনের ভাত পাই, সন্ধ্যায় এনে পাঁচ জনে ভাগ করে খাই
অনাহারে দু মাস পরে স্বামী হারাল প্রাণই ॥
তিন দিন পর ক্ষুধার জ্বালায়, অভাগীর বুক শূন্য করে বাছা আমার যায়,
আমার শাশুড়ী শোকের জ্বালায় কোথায় গেল নাহি জানি ॥
এই লিখা ছিল কপালে, পতিহারা পুত্রহারা হলেম অকালে,
শান্তি পাব কোথায় গেলে, বল দেশের মা ভগিনী ॥

সাতচল্লিশে স্বাধীন পাকিস্তান, আশা করলাম এবার বোধ হয় বাঁচিবে পরাণ,
এখন ভিক্ষায় গেলে ভিখ্ মিলে না, দুদিন পর আর কি হয় ন জানি।
স্বাধীনতার ফলে এই কি ফল, অন্নবিনে শীর্ণকায় স্ত্রী পুরুষ সকল,
বস্ত্রহীনা, ক্ষীণতনু দেশের যত কুল কামিনী॥

১১।৫।৫৪

৬৪

শুনরে ভাই আজগুবী খবর
মন্ত্রী করে চট্টগ্রাম সফর।
দিনের তিনটা বেজে গেল ময়দানে সভা বসিল।
হায় কি দেখিলাম কি ঘটিল মানুষ ভয়ে জড়সড়।
হঠাৎ দেখি পচা আণ্ডা মন্ত্রীরে করিতে ঠাণ্ডা
উড়তে লাগলো কালো ঝাণ্ডা মন্ত্রীর চোখের উপর
আণ্ডার মিছিল শুরু হল মেঘে যেন বৃষ্টি এল
মন্ত্রী সাহেব চমকে গিয়া আসন ছাড়ি দিল দৌড়।
তারপর এক আশ্চর্য কথা ছুটে এল ছেঁড়া জুতা
মন্ত্রী ভাবে যাবে কোথা পলাইবার নাই অবসর।
বিপ্লবী চট্টগ্রাম জিলা সূর্য সেনের প্রধান কিল্লা
মন্ত্রী করে তোবা তিল্লা আসবে না জনম ভোর।

১৯৫৫

৬৫

আমি বাংলা ভালবাসি,
আমি বাংলার বাংলা আমার ওতঃপ্রোত মেশামেশি।
বাংলা দেশের রাস্তায় চলি, মুখে ছুটে বাংলা বুলি,
বাংলা বলি হৃদয় খুলি মুখে ফুটে হাসি।

বাংলা ভাষায় হাসি কান্দি স্বপন দেখি দিবা নিশি,
চিরদিন বাংলার আশা, বাংলা দেশে করি বাসা,
বাংলা আমার মাতৃভাষা বাংলার প্রত্যাশী।
বাংলা ভাষায় মাকে ডাকি, বাংলা আমার মিঠা বেশী।
গেলে বাংলা নদীর তটে, আনন্দে প্রাণ ভরে উঠে,
সোনালী ধান বাংলার মাঠে দোলে রাশি রাশি।
বাংলার দোয়েল শ্যামার ডাকে মন প্রাণ করে উদাসী,
বাংলা দেশে ফলে ফুলে, কিবা শোভা শ্যামল দোলে,
বাংলা দেশে সুধা ঢালে শারদীয়া শশী,
বাংলা আমার গয়া গঙ্গা বৃন্দাবন মথুরা কাশী।
বাংলা আমার জন্মভুমি, বাংলা মায়ের চরণ চুমি,
দৈনন্দিন বাংলাকে নমি বাংলা দেশে বসি
বাংলা দেশের ধূলিকণা স্বর্গাদপি গরিয়সী।
সোনার বাংলায় সোনা ফলে, তার তুলনা কোথায় মিলে,
বাংলার জন্য জীবন গেলে হব স্বর্গবাসী।
আমার ঠিক থাকিবে বাংলার দাবী যদিও হয় জেয়েল ফাঁসি॥

ঢাকা জেল, ১৯ | ৬ | ৫৪

৬৬

মোরা মাটির মানুষ মাটি নিয়া সারাদিন কাটাই,
মাটির সঙ্গে কোলাকুলি মাটি দিয়া সোনার ধান ফলাই।
এই মাটিতে মোদের জন্মগত অধিকার, অস্বীকার করিবে যে সে দৈত্য দুরাচার,
এই মাটিতে দেহ গড়া, বুকের রক্ত দিয়া মাটি চাই।
এই মাটিতে জীবন মরণ, এই মাটিতে বাস,
এই মাটিতে ফসল ফলাই থাকি বার মাস,
মাটি মোদের স্বর্গ সুধা, মাটি বিনে শান্তি নাই।
পরিশ্রান্ত হলে মাটির বুকেতে বিশ্রাম,
মাটির অর্চনা করি দিয়া মাথার ঘাম,

মোদের জীবন যুদ্ধ অবসানে মাটির কোলে শুয়ে নিদ্রা যাই।
কোথায় আছ ছুটে এস মাটির মানুষগণ,
ভেদাভেদ ভুলিয়া কর জীবন মরণ পণ,
মাটি মোদের খাঁটি সোনা, সোনার তরে এবার শেষ লড়াই ॥

ঢাকা জেল, ১৭ | ৮ | ৫৪

৬৭

হিন্দু মুসলিম ভাই, একযোগে দাঁড়াই
চল চল দেশ গঠনে।
হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রীস্টান
বাংলার যেন এই চারি সন্তান,
সবার জন্মভূমি স্বাধীন পাকিস্তান
দ্বিধা আছে বল কোন্‌খানে ॥
সভ্য শিক্ষিত দেশে ভদ্র যারা
অশিক্ষিতের সঙ্গে মিশতে চায় না তারা
সভ্যতার গৌরব হইবে হারা
মনে সদা এই ভাব পোষণে।
মূলে এই গলদ কেহ নাহি চায়
অজ্ঞ মূর্খ যারা আছে অশিক্ষায়
শিক্ষিত, নিরক্ষর যদি হাত না মিলায়
শিক্ষার উন্নতি আর কেমনে ?
ঘুরে ফিরে আসে দুর্ভিক্ষ প্রচণ্ড
নির্বিচারে নিরীহ লোকে পায় দণ্ড
স্বার্থলোভীর এই সব কৌশল কাণ্ড
মুনাফা শিকারের কারণে ॥

অতি কষ্ট করে পেলেম পাকিস্তান
হাত মিলাও দেশের হিন্দু মুসলমান,
শোষক দলের কর শাস্তির বিধান,
স্বদেশ উন্নতি সাধনে ॥

চট্টগ্রাম জেল, ৩ | ৯ | ৫৪

৬৮

সর্বহারার দল, ছুটে আয় সকল
দুশমন হটাতে হবে ডাক পড়েছে।
আমাদের খুনেতে যারা তুলেছে বড় মিনার
রক্ত মাংস চুষে খেয়ে করেছে কঙ্কাল সার
আর যে সময় নাই, ত্বরায় ছুটে এস ভাই,
বেদনার প্রতিকারের সময় এসেছে
ক্ষত বিক্ষত হিংস্র জন্তুর আঁচড়ে
আঘাতে দারুণ ব্যথা হয়েছে ভাই পাঁজরে,
দিকে দিকে ডেকে কও আর নয় আর নয়
সহ্য-সীমা অতিক্রম হয়েছে।
যা হবার হয়ে গেছে, আর কারে কর ডর
আগ্নেয়গিরি সম দিকে দিকে ফেটে পড়
শুন সর্বহারা ভাই, এবার মোদের শেষ লড়াই
দুনিয়াময় গণডঙ্কা বেজে উঠেছে ॥

ঢাকা জেল, ১১ | ১১ | ৫৪

৬৯

গুণ্ডার নাই কোন জাত বিচার, ভাই হুঁশিয়ার
তারা হিন্দু নয় মুসলিম নয় মানুষ-রূপে জানোয়ার।
ফিকিরে ফিকিরে ঘুরে টাকার লালসায়,
টাকা যার পকেটে পায়।

হিন্দু মুসলিম বিচার নাই তার ঐ বেটারা পকেটমার।
দাঙ্গার দালালি যখন দুষ্ট গুণ্ডায় পায়
তখন চার পায়ে আউগায়,
লুঠতরাজ, হত্যা চালায় ধর্মাধর্ম নাই বিচার ॥
হউক আত্মীয় বন্ধুবান্ধব গুণ্ডা যদি হয়
তারে দিওনা প্রশ্রয়,
দমন করলে দেশে শান্তি রয় নয় ঘটাবে অত্যাচার।
স্বাধীন পাকিস্তানী মোরা হিন্দু মুসলিম ভাই,
পাক জায়গায় গুণ্ডার জায়গা নাই,
প্রাণপণে গুণ্ডা খেদাই সুনাম রাখ পাক জায়গার ॥

৭০

বাজিছে রণ-ভেরী গগন বিদারি জাগ জাগ মুক্তি সেনাগণ
মানবধ্বংসী দানব দলে রুখে দাঁড়াও দলে দলে
শান্তি রাজ্য করিতে স্থাপন ॥
অসুরের পদ ভরে ধরা টলমল করে পরিত্রাহি ডাকে জনগণ
ছুটে এস মায়ের দল সঞ্চারিয়া নব বল, অগ্রণী বাহিনী ছাত্রগণ,
চাষীরা ফসল ফলায় সেই ফসল পরের গোলায়
উপবাসী থাকে চাষীগণ ॥
কারখানায় মজুর যারা, উপবাসে থাকে তারা
কে করিবে শিল্প উৎপাদন ॥
যুগ যুগান্তর বাংলা দেশে মুসলিম হিন্দুর পাশে,
পাশাপাশি জীবন যাপন ॥
এখন বাঙালী আর বাঙালী বিভেদের আগুন জেলে
দগ্ধ করে জনতার জীবন ॥
বাড়ি ভিটা বিক্রি করি ছেলে পড়ায় তাড়াতাড়ি
করবে বলে অর্থ উপার্জন ॥

সরকারের শিক্ষানীতি জনমনে লাগে ভীতি
ছাত্র দেখে ধ্বংসের আয়োজন ॥
পাকিস্তান উন্নত হবে একযোগে দাঁড়াও সবে
হতাশার কি আছে কারণ।
মোদের দুঃখ দৈন্য চলে যাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে
মেহনতীর দাবী হইলে পূরণ ॥

ঢাকা জেল, ১০ | ১ | ৫৫

৭১

হাত মিলাও, হাত মিলাও, হাত মিলাও,
হিন্দু মুসলিম হাত মিলাও, ভায়ে ভায়ে হাত মিলাও, হাত মিলাও
আমরা কারো বাধা আর মানব না, বিভেদের কথা শুনব না,
হিন্দু মুসলমানে বৌদ্ধ খ্রীস্টানে মিলে প্রাণে প্রাণে হাত মিলাও
আমরা শান্তির দামামা বাজাব, আমরা পাকিস্তানকে সাজাব,
মিলন ঝাণ্ডা কাঁধে করি চলব সবে, হাত মিলাও।
মোদের দুশমন কাহারা চিনেছি, মোরা শান্তির সন্ধান পেয়েছি
একতার পথে হাত বাড়ায়ে আফ্রো এশিয়া হাত মিলাও,
আমরা যুদ্ধ নাহি চাই, মানুষ মানুষের ভাই,
বিশ্বশান্তির অতন্দ্রপ্রহরী, সবার সাথে হাত মিলাও ॥

ঢাকা জেল, ১৭ | ৪ | ৫৫

৭২

রস্তার বাপ্ রে রস্তার বাপ উপাই কি ভাই রস্তার বাপ
বুদ্ধি দে ভাই কোন্ প্রকারে এবার জান বাচাই।
একেতে বরিষার কাল দারুণ আষাঢ় মাস
পোয়া ছা লই হইলাম আঁই (আমি) তিন অক্তর উয়াস
পোয়া দুয়া মাইয়া উগ্‌গা (একটি) কাঁদি হই যায় খুন
ঘরত নাই একদানা চৈল ভাত দিয়ম কত্থুন (কোথা থেকে)।

বিষ পাইতাম বিষ খাইতাম ওভাই, বিষ কিনতাম ত পইসা নাই
হাডত (হাটে) চৈল তিন পাবা (পোয়া), একসের চাইলাম আমি
চৈল অয়লা কয়, কিরে মিয়া কত্থুন আইস্ত লামি (নেমে এসেছ)।
ঘরত গেলাম জননা (স্ত্রী) কয়, ছাড়ি দেরে মোরে
মাগি খুঁজি খাইয়ম আমি, যাইয়ম বাপের ঘরে।
এত জ্বালাত পজ্জিযে (পড়েছি যে) ভাই, ধাইবার পন্থা নাই
প্রেসিডেনের বাড়ি গেলাম, রেশানের চৈল দিত,
প্রেসিডেনে কয়, তুই পাইলে ত হক্কল মাইন্‌সে পাইত।
ভোডর সমত কৈল তেঁই, আঁয়ারে (আমাকে) ভোট দিও,
ভাত কায়রে (কাপড়ে) দুঃখ পাইতা নয়, বিশ্বাস করি নিও,
আর কারে কৈজ্জম (করব) বিশ্বাস, বিশ্বাসের বাপ বাঁচি নাই।

গোমদণ্ডী, ১০।৭।৫৫

৭৩

উঠেছে শান্তির নিশান, ছুটে আয় মজদুর কিষান,
বাজে মিলনের বিষাণ চিন্তা কিরে আর।
ঐ ছুটেছে দলে দলে শান্তির পতাকা তলে
দুর্নীতি আর শোষণেরে করিতে সংহার।
নির্যাতিত নিপীড়িত দেশের যত জনগণ
শান্তি সলিলে সবে করিবে অবগাহন।
মানবধ্বংসী দানবগণ লোভে ক্ষিপ্ত অনুমান
মরণ কামড় দিতে বুঝি উদ্যত এবার।
অনশন অর্ধাশন সহিয়াছ বহুদিন,
সুদিন এসেছে ভাই আর কেন মুখ মলিন।
দুঃখ নিশি অবসান, গাও সবে শান্তির গান,
নবারুণ উদ্ভাসিত হতেছে আবার।
এ বিশ্ব মানব যত সবাই যেন ভাই,
দিকে দিকে আওয়াজ উঠে শান্তি চাই, শান্তি চাই।

এতে নাই ভুলভ্রান্তি আসিবে বিশ্ব শান্তি,
বিশ্বমানব হবে এক মহান পরিবার।

ঢাকা জেল, ২২ | ৭ | ৫৫

৭৪

শুন বন্ধুগণ, দুর্দিনে শ্রমিকের বিবরণ।
উৎপাদন বাড়ায় শ্রমিকে, বুঝে না কেন মালিকগণ।
রক্ত ঢালি শক্তিশালী করে যারা কারখানা
দুর্দিনে বেতনে তাদের পেটের খোরাক পোষায় না,
মালিকেরা নজর দেয় না শ্রমিকের প্রতি কি কারণ।
কারখানার কাজ বিনে মালিকগণে কারখানা কিসে চালায়,
পরস্পর সম্পর্ক আছে আর্থিক বন্ধন।
ন্যায্য মজুরী যদি কারখানার শ্রমিকে পায়
কারখানার উৎপাদন বাড়ায়, ধর্মঘটে নাহি যায়।
মালিক নিজের পেট মোটা চায়, সংঘর্ষ হয় তার কারণ।
শিরদাঁড়া বিনে যেমন মানুষের অস্তিত্ব নাই,
তেমনি দেশের মেরুদণ্ড মোদের কৃষক শ্রমিক ভাই,
মজদুরের বাঁচার তরে শ্রমিক ঐক্য প্রয়োজন॥

গোমদণ্ডী, ১৩ | ২ | ৫৬

৭৫

ও ভাই, হাল জামানার চালে
বড়লোকে মোটর হাঁকায়, গরীব পড়ে যায় তলে।
মুখে কত মিষ্টি বুলি, ছুরিখান বগলে॥
কত মোড়ল সরল সেজে হয় কাজের কাজী,
ঘুম পাড়ানি গান শুনায়ে দেখায় ভেলকিবাজি,
তারা গোপন হাতে মজা লুটে গরীব টের পায় না মোটে,
কৌশলে গাছের গোড়া কাটে, উপরে জল ঢালে।

ধনিক বণিক মালিক সবাই গাঁটছড়া বাঁধা,
সাদা দিলে মোটা দাগে দেখায় গোলক ধাঁধাঁ।
আমার খুনে মোটর-গাড়ি তেতালা চৌতালা বাড়ি
আমার খুনে রেডিও আর বিজলী বাতি জ্বলে॥
আমি কৃষক তুমি মজদুর দিনে রাতে খাটি
দুই শক্তি এক হলে মোরা পিছু কবে হটি,
এক সঙ্গে নিঃশ্বাস ছাড়ি পর্বত উড়াতে পারি
দুশমন চক্রে চাও না ফিরি কি আছে তার মূলে।

গোমদণ্ডী, ১৭ | ৫ | ৫৬

৭৬

হৈ আয় চাষী ভাই জোর গলায় গাই চাষীর জয় গান।
নূতন মেঘে ডাকছে বান মাঠে ফলবে সোনার ধান।
বায়ুর তালে শ্যামল দোলে হেরে জুড়ায় প্রাণ।
আবার তুলব নূতন ঘর, শক্ত করে লাঙ্গল ধর,
কিসের ডর কারে ডর, ধর কাস্তে খান্।
যারা কাড়ে পাতের ভাত, তারা নয়ত মোদের জাত,
মোরা চাষী সবাই একজাতি ভাই হিন্দু মুসলমান।
মোদের একগ্রামে বাস, করি একমাঠে চাষ
আছে ভাষার মিলন, মানসিক সংগঠন, কিসের ব্যবধান॥

গোমদণ্ডী, ২৫ | ৫ | ৫৬

৭৭

চাষীর গলায় ফাঁসির দড়ি পড়ে চাষীরে কইও।
চাষী করে মাছের চাষ, চাষী পালে মুরগী হাঁস,
ছাগল ভেড়া সকল চাষীর ঘরে।
সেই চাষী মরে যাবে, দেশে খাদ্য কোথায় পাবে
চাষীকে কেহ চায় না ফিরে॥

পাট ক্ষেত্র করে চাষী, তুলা জন্মায় রাশি রাশি
চা পাতা হয় চাষীর জোরে
পাট তুলা চা বিদেশে যায়, ধনীরা মুনাফা খায়
চাষী বেটা তিলে তিলে মরে ॥
বাঙ্গালী বাঙ্গালীর বাড়ি, প্রথম দিবে তামাক বিড়ি,
পান স্থপারী দিবে তার পরে।
চাষীর গুণে লৌকিকতা, কেহ কি বুঝে সেই কথা,
চাষী মারে দেশের জমিদারে ॥
কম লোকে কাজ বেশী হত, দ্বিগুণ ফসল ফলিত,
যদি নাকি চাষ হত ট্রাক্টারে।
ছিল মান্ধাতার আমলে, বলদের পিছে লাঙ্গল ঠেলে
তার ফলে আজ খাদ্য ঘাটতি পড়ে ॥
কৃষিপ্রধান যেই দেশ, কৃষি কৃষক হলে শেষ
সেই দেশ বাঁচিতে না পারে।
খাল কাটা বাঁধ বাঁধা হলে, কি করিত বন্যার জলে
চাষী উচ্ছেদ হত আর কি করে ॥

গোমদণ্ডী, ১৭ | ৮ | ৫৬

৭৮

শুন পাকিস্তানীরে ভাই শুন পাকিস্তানী
দুই দিনে এক অক্ত খাইয়ম আগেত ন জানি।
বৌ আর পোয়া নেই তিন অক্তর উয়াস হৈ,
পরণের কায়র বেচি তারপর চৈল ছোড়াই আনি।
ভাতর বাসন বেচি ভাই কেলার পাতাত ভাত খাই
পানি খাইতাম বদনা নাই, মালাত লই খাই পানি।
দিব মোটা ভাত কাপড় কইল আঁয়ারারে মেম্বর
কতে গেল হেই ভাত কাপড়, জান লই টানাটানি।
যখন ভোট কাছাইব ভাই, দিনত তিনবার দেখা পাই,
উপাসে বিছানাত গড়াই, আর দেখা পাই নি।

চট্টগ্রাম, ২৯ | ৯ | ৫৬

৭৯

শ্রমিকের দরদী ভাই জগতে নাই, ও দেশের ভাই,
পেটের ক্ষুধায় শ্রমিক মরে কে শুনে তার ডাক দোহাই ॥
শ্রমিকদের মাহিনা দিয়া খরচ না পোষায়,
হা হুতাশে দিন কাটায়, ভাতা চাইলে উল্টা বলে
বার ঘণ্টাতে ছাঁটাই।
উৎপাদন বাড়াতে আদেশ করে মালিকে, শ্রমিকের দুঃখ বুঝিবে কে
স্ত্রীর পরণে কাপড় নাই।
পাঠ্য পুস্তক কাগজ কালি স্কুলের বেতন দিতে নারে শ্রমিকগণ,
রুটির দাবী হয় না পূরণ কি দিয়ে ছেলে পড়াই।
চা বাগানে রেলে মিলে শ্রমিক ভাইয়েরা যেমন প্রাণ থাকতে মরা
মড়ার ঘাড়ে পড়ে খাঁড়া ভাতা বোনাস যদি চাই
আবেদন নিবেদন কত করি প্রাণপণে, মালিক কানে না শুনে,
এবার জানাইব জনগণে ধর্মঘটের ঢোল বাজাই।

গোমদণ্ডী, ৫। ১২। ৫৬

৮০

দেশত্যা (দেশবাসী) ভাই বোনরে এবার মানুষ বাঁচিব কেমনে
এবার মানুষ বাঁচিব কেমনে।
অঘোর বরিষা কাল, ঘরত (ঘরে) নাই এক দানা চাউল
থালিবাটি নিল মহাজনে।
তার উপরে টেক্সের বোঝা রমজান ছাড়া থাকি রোজা
এই বিচার করেনি কোন জনে
হইলে টেক্স, মইলে টেক্স, ঘরবাড়ি গরুর টেক্স
উনত্রিশ রকম টেক্স হইল আইনে ॥
মাটি কাটি, লাকড়ি চিরি, মাথার ঘাম পায়ে পড়ে
দশ ঘণ্টা দেড় টাকা বেতনে।

তবু দিন মাহিনা নগদ নাই, সন্ধ্যাবেলা হাটে যাই
চাউল কিনি থাল ঘটি দিয়া মহাজনে।
দুই দিনে এক বেলা খাই, রক্ত মাংস কিছু নাই
দারুণ টেক্স হাড্ডি ধরি টানে॥
জান বাঁচাইবার রাস্তা খোল, সময় থাকতে আওয়াজ তোল
নইলে ধ্বংস হইবা আপনি পরাণে॥
এবার মানুষ বাঁচিব কেমনে।

৮১

প্রথমে প্রভুর নাম করিয়া স্মরণ
মাতা পিতার করিলাম চরণ চুম্বন॥
দেশের দুর্গতি যত ২* বলি কত, গণা নাহি যায়।
দেশবাসীর কাছে জানাই এই অভিপ্রায়॥
শুন পাকিস্তানীগণ ২ বিবরণ হিন্দু মুসলমান
অন্ধকারে আলো এল পেয়ে পাকিস্তান॥
দুইশত বছর পরাধীনে ২ কুশাসনে প্রাণ ওষ্ঠাগত।
শ্বেতাংগ কবলে পড়ি দুঃখ পাইলাম কত॥
উমিচাঁদ মীরজাফরে ২ ক্লাইভেরে আনিল ডাকিয়া।
দেশের দুলাল সিরাজেরে দিল ধরাইয়া
বাঙালীর গৌরব রবি ২ গেল ডুবি সেদিন হইতে।
বহুজনে জীবন দিল দেশ উদ্ধার করিতে॥
১৯৪৭ এ ২ এল আজাদীর বাতাস
আট কোটি নর নারীর মনেতে উল্লাস
জাতির নেতা কায়েদে আজম ২ আবে জম্‌জম্ আনিয়া দিয়াছে
রক্ত শোষা জোঁক আর মশা আসিয়া জুটেছে॥
লুটের কারবার শুরু হল ২ দেখা গেল, যে যেদিকে পায়।
গরীবকে ঠকাইয়া তারা লুট করিয়া খায়॥

* এখানে ২ এর অর্থ, এই অংশটুকু দুবার করে পড়তে হবে।

নিত্য প্রয়োজনী মাল ২ বেসামাল, দাম হইল চড়া।
ক্রয়ক্ষমতা কারও নাই, হাহাকার দেশ জোড়া ॥
বাজারে পায় না চিনি ২, কেমনে কিনি, তিন টাকা তার সের
ছয় টাকা সাগুদানা মোদের ভাগের ফের ॥
নারিকেল তৈল আট টাকায় ২ পাওয়া যায়, ভেজাল ছাড়া নাই
মেয়ে লোকের চুল উঠি যায় কি করি উপায় ॥
যত চোরা কারবারী ২ গেল বাড়ি বছরে বছরে
রেডিও ইলেকট্রিক ফেন ঘুরে তাদের ঘরে ॥
দোতালা তেতালা বাড়ি ২ গরীব মারি তারা টাকা লুটে।
ছেলে মেয়ের ক্ষুধার জ্বালায় মা বাপ মাথা কুটে ॥
শিশু রোগী পথ্যহীন ২ দিন দিন শীর্ণ হয়ে যায় ॥

৮২

মাঝি চল রে উজান বাইয়া
বেগে ছুট পিছু না হট সামনের দিকে চাইয়া।২
মেঘ কেটেছে আঁধার ঘুচেছে, জোরে ধর হাল,
উষার আলোক ঝলক দিয়েছে সূর্য উঠেছে লাল।২
ঐ দেখা যায় আশার আলো, আগে চলো আগে চলো,
জীর্ণ আবর্জনাগুলো ফুৎকারে দাও উড়াইয়া ॥২
ভাটার গাঙে জোয়ার এল, জল ঝরে কল কল,
সাহস ভরে কোমর বেঁধে আগের বাঁকে চল।
চলছে নৌকা ঢেউয়ের তালে ঢোলক বাজাও তালে তালে,
সারি গাও সবাই মিলে করতালি দিয়া ॥২
দাঁড়ী মাঝি আরোহী সবাই এক প্রাণ,
সুখের দেশে চলছি মোরা নদীতে উজান,
হাঙ্গর কুমীর পাছে ঘুরে নররক্তের লালা ঝরে,
ভয় করোনা চালাও জোরে, বাদাম দাও উড়াইয়া ॥

গোমদণ্ডী, ৮।৩।৫৮

৮৩

এই বরিষাত আমার তালাস লইও রে হাছন্যার বাপ।
(হাছন্যার বাপ রে) হালের গরু বেচি খাইলাম দারুণ ভাতের জ্বালা।
বৌয়র গহনা বেচি খাইলাম, বৌয়র সোনামুখ কালা ॥
(হাছন্যার বাপ রে) বৌয়ের জ্বালা পোয়ার জ্বালা কত সইতাম পারি।
আমি যদি একজন হইতাম ন খাই থাকতাম পারি ॥
(হাছন্যার বাপ রে) কাম করচ করিত ন পারি গায়ত জ্বর উঠে বেশী
মনে কর মরিয়া যাইতাম গলায় দিয়া ফাঁসি ॥
(হাছন্যার বাপরে) চালর ছানি (১) পোঁচ গেইয়ে (২) বৃষ্টি হইলে উড়ে (৩)।
ঠুলির গোড়া (৪) উইয়ে খাইয়ে বাতাস আইলে লরে (৫) ॥
(হাছন্যার বাপ রে) তুফান আইলে ঘুম ন ধরে পরাণ কাঁপে ডরে
কন্ দিন জানি এই ঘর পড়ি মোরে চাপি ধরে ॥
(হাছন্যার বাপ রে) পেটের ক্ষুধায় পেট কচালে হাঁটতে মাথা ঘুরে
গিরাত (৬) নাই আট কড়া কড়ি, চৈল কনে দিব মোরে ॥

(১) চালের ছাউনি (২) পচিয়া গিয়াছে (৩) চুয়াইয়া পড়ে (৪) খুঁটির গোড়া (৫) নড়ে (৬) গাঁটে

গোমদণ্ডী, ৮ | ৩ | ৫৮

৮৪

ওরে ওরে চারণ ভাই আজ তোমার ছড়া টরা,
গান টান কিছু টিছু শুনি টুনি না।
বাড়ীত টারিত আসতা টাসতা ছড়া টরা কইতা,
মাইয়া পোলা হুনত টুনত চাউল টাউল পাইতা।
বাউল টাউল কডে গেইয়ে দেখা টেকা নাই,
লক্ষ্মী চরিত কইত টইত কডে গেলগৈ ভাই।
বৈরাগী টৈরাগী কৃষ্ণের শত নাম ত করে না,
হাল টাল চৈত হাল্যা ভাইয়ে হাল্যা সাইর মারি।
ভোঁয়র টোঁয়র গাইত-টাইত লম্বা গলা ছাড়ি,
শ্রাবণ মাস্যা পুথি টুথি আগর মতন নাই।

বিয়াত টিয়াত ইলা টলা হুনা ন যায় ভাই,
হাসি খুসি গেরামত নাই একি তাজ্জব কারখানা।
মানত টানত কইরত মাইন্সে গাজীর পালা দিত,
পোয়া টোয়া না হয় যদি দোয়া টোয়া লইত।
ফুলপাত টুলপাত হইত লোকের বাড়ী বাড়ী,
বহুরূপী সাজ টাজ লইত নানা ভঙ্গী করি।
মহরমত জারি টারি এখন কিছু শুনি না,
দোলত টোলত হুলি টুলি রং টং উড়ি গেইয়ে।
ঢাকি টাকি গৌরী টৌরী নাচান ক্ষেমা দিয়ে॥
চান্নি পইজ্যা নৌকাত টৌকাত মাঝিয়ে গান গাইত।
ভাটিয়ালি সুর টুর দিলে পরাণ কারি নিত।
আমোদ টামোদ আগর মত এ কন কিছু দেখিনা
চারণ কয় ছড়া কবিতা কইত বাপ দাদায়।
কিল্যাই কইতাম হেই কবিতা খোরাক ন পোষায়,
হারা দিন কামগরি মানুষ পেট ভরি ন খায়।
পোয়া ছালই উয়াস থাকের আঁয়ারে কনে চায়ার!
আমোদ টামোদ উড়ি গেইয়ে এক্কই ভাতর যন্ত্রণা॥

গোমদণ্ডী, ১০।৮।৫৮

৮৫

সকল ব্যবসা বন্ধ এখন খোলা কেবল গুরুর দ্বার
অল্পদিনে ব্যবসা জমে, হইলে কয়জন কেম্বাচার।
গেরুয়ার আর দাড়ি চুলে, ব্যবসার সাইন-বোর্ড তোলে,
কেম্বাচার কয় কলিকালে, এমন সাধু পাওয়া ভার।
কেম্বাচার কয় লোকের কাছে এসে পাঁচ শ জন শিষ্য আছে
অমুকে মন্ত্র নিয়াছে, অমুক দেশের জমিদার।
দেশে দেশে কেম্বাচ চালায়, গুরুর কাছে কমিশন পায়।
কয় আমার গুরু মামলা জিতায়, ছেলে হয় জন্ম-বন্ধ্যার।

বক্ বাজিতে শিষ্য জোটায়, মহোৎসবের চাঁদা উঠায়,
বৎসরান্তে বার্ষিক আদায়, ভিতরে শূন্য অন্তঃসার।
নিরীহ সরল যারা, এদের কাছে ঠকে তারা,
রাং কি সোনা পরখ করা, শক্তি থাকে কয় জনার।
এই সব ভণ্ড সাধুর দলে, দেশ দিল ভাই রসাতলে,
ভেবে তাই রমেশ বলে, এদের হ'তে হুশিয়ার।
গেরুয়া কি সাদা পোশাকে, যদি সত্য বস্তুর সন্ধান রাখে
স্থিতপ্রজ্ঞ বলি তাকে দণ্ডবৎ দিই হাজার বার॥

গোমদণ্ডী, ১০।১১।৫৯

৮৬

চাষী ভাইরে চাষী ভাই, মজুর ভাইরে মজুর ভাই
দেখছনি ভাই চাষী মজুর ধ্বংসের নমুনা।
পাকিস্তানের বার বছর গত হইয়া গেল
ঢালা শুরু করল তারা তেল্যা মাথাত তেল।
একটা একটা করে চাইয়রে ভাই স্বাধীনতার গুণ
ক্রমে ক্রমে খাজানা টেক্স বাড়ে দশ বিশগুণ।
জ্বালাইল অশান্তির আগুন কার কি ও ভাই অজানা,
চাষী মজুর ধ্বংসের নমুনা।
পাকিস্তানে মানুষ বাড়ে কম পড়ি যার খানা
বাতাস খাইনি বাঁচি রইয়ে সত্তর কোটি চীনা।
পোয়া হ'ন বন্ধ হইলে পেট ভরা ভাত পাইবা,
ঘরত বই দিনে রাতে জিন্দাবাদ গাইবা।
উনত্রিশ রকম টেক্স দিবা আর কিসের ভাবনা
চাষী মজুর ধ্বংসের নমুনা।
মজুরের মজুরী করা আছে চিরকাল
ভাতা বোনাস চাইলে মালিক চক্ষু করে লাল।
মজদুরে ধর্মঘট করার বুদ্ধি যদি লইব
গুণ্ডাদলে ডাণ্ডা মারি ঠাণ্ডা করি দিব।

মাইর খাই ভূত হই যাইব, তবু তার কাঁদন মানা
চাষী মজুর ধ্বংসের নমুনা।
কি লাভ হইল বাঙালীদের স্বাধীনতা পাই,
কপাল মন্দ কারে কইয়ম, মানুষ একযোগ নাই।
একযোগেতে দাঁড়াই যদি চাষী মজুরগণ,
আকাশের চাঁদ মাটিতে আনতে লাগে কতক্ষণ।
না করিলে দুঃখ বরণ সুখের আশা দেখিনা
চাষী মজুর ধ্বংসের নমুনা।

ঢাকা জেল, ১১ | ১১ | ৫৯

৮৭

একসাথে সব চল রে ভাই একসাথে সব চল,
মিলে মিশে এগিয়ে চল হইবে মঙ্গল ॥
ন্যায় নিষ্ঠা কর্তব্য বুদ্ধি আর দায়িত্বজ্ঞান,
এই চারি চরিত্র ভাই সুখের নিদান।
আদর্শ ঠিক রেখে চল জাতির কল্যাণে,
সৃষ্টিশীল মনোভাব হিন্দু মুসলমানে।
ভাই ভাই একসাথে সব চল।
(তবে) এই পাকিস্তান সোনার মত হইবে উজ্জ্বল ॥
প্রথমে চরিত্র গঠন মনে রেখ ঠিক।
সৎগুণে ভূষিত হতে হবে নাগরিক।
কলহ বিবাদ ঝগড়া অশুভ লক্ষণ।
এই সকল দোষে ঘটে জাতির পতন।
ভাই ভাই একসাথে সব চল
(আরও) বিশেষ করে হতে হবে স্বজাতি বৎসল।
দয়া ক্ষমা চিরদিন মনে রেখ ভাই।
দরিদ্র পোষণ যেন ভুলে নাই যাই।
গঠনমূলক কাজে সবে একযোগে দাঁড়াব।

হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই হাত মিলাইব।
ভাই ভাই একসাথে সব চল।
কুসংস্কার মুছে ফেলে হইব নির্মল ॥
যেমন অংগ প্রত্যংগ নিয়ে দেহের গঠন হয়।
তেমনি মা বোনকে বাদ দিয়ে মোদের সমাজ গঠন নয়।
মাতৃজাতির সম্মান দিতে যেই জাতি না জানে।
সেই জাতি উন্নতি সোপান পায় না কোন দিনে।
ভাই ভাই একসাথে সব চল।
(মোদের) দূরদৃষ্টি থাকতে হবে অটল মনোবল।
মহাশান্তি মিলনেতে বিচ্ছেদে বিবাদ।
দেশের শান্তি দেখব বলে মনে ছিল সাধ।
জীবন সন্ধ্যায় এসে দুইটি কথা বলি।
ঝাঁটিয়ে ফেলতে হবে দুর্বলতাগুলি।
ভাই তাই একসাথে সব চল।
পল্লীকবির শেষ প্রার্থনা শুন ভাইসকল ॥

গোমদণ্ডী, ১৩ | ৩ | ৬০

৮৮

আরে ও সুলতান্যার বাপ দুঃখের কথা কইতাম
আমার বান্ধব আছে নি
(ভাইরে) পেট ভরি ভাত খাইত ন পারি,
গায়ের বল হৈল হানি ॥
মাছ গোস্তর দেখা নাই ভাই ছেরেব ডাইলের পানি ॥
হারাদিন মজুরি গারি দুয়া টেঁয়া আনি।
হাডত গেলে সওদা কইত্তাম চোখের পড়ে পানি ॥
ছনর দাম আছমান ছুইয়ে ঘরত নাই মোর ছানি।
আল্লা জানে কডে থাক্যম বরিষাত পইলে পানি।
মরিচের সের পাঁচ টেঁয়া ভাই এক ছটাক লই কিনি ;
মরিচ পুড়ি পানি-ভাত খাইতাম তক্কফিকে কুলায় নি ॥

গোমদণ্ডী, ১৩ | ৪ | ৬০

৮৯

চাষী ভাই বোন রে মেঘে দিল জল।
হাল বলদ হোক্কা লইয়া মাঠের দিকে চল॥
(ও) গেল রবি শস্য আউসের চারা অনাবৃষ্টির ফলে॥
আমন ফসল ভাল হবে নূতন মেঘের জলে॥
মেঘ আমাদের প্রতিবেশী মেঘ আমাদের ভাই।
মেঘের জলে সোনার ফসল গোলা ভরা পাই॥
মায়ে যোগায় ফসলের বল, মেঘে যোগায় পানি।
মাটির ছেলে জল কাদাতে করি জিন্দেগানি॥
(ও) কিছিম কিছিম জমিতে দিব কিছিম কিছিম ধান।
ধানের ভিতর মান ইজ্জত ভাই, ধানের ভিতর জান॥
কার্তিক মাস আসিলে সোনার ধানে আসে থোড়।
মনেতে আনন্দ লাগে মাজায় লাগে জোর॥
(ও) (সোনার ধানে) হিন্দু ভাই নবান্ন করে মুসলিম ভাই শিরণী।
একপদ গহনার আবদার করি কত যে খুশী গিন্নী॥
চিকন ধান পাকিলে দোলে লম্বা লম্বা ছড়া।
জামাই এলে বানাই দিব চিকন ধানের চিড়া॥
(ও) গোলায় তুলিলে ধান প্রাণে শান্তি আসে।
গুড়া পিডা কাটতে বৌয়ে পুড়ুর পুড়ুর হাসে।
সোনার ধান নষ্ট করে জন্তু জানোয়ারে।
মাটির মানুষ একযোগ হলে রক্ষা করতে পারে॥

গোমদণ্ডী, ১৫ | ৪ | ৬০

৯০

আমরা চাঁড্ডি গাঁইয়ারে ভাই, আমরা চাঁড্ডি গাঁইয়া।
হরেক কাজে আগে সহায় বারো আউলিয়া।
আমরা নৌকা সাম্পান চালাই মনে ভয় ভাবনা নাই
ঢেউয়ের মাথায় সাম্পান নাচাই, বাদামখানি তুলিয়া।

আমরা ফসল ফলাই, কারখানায় হাতুড়ি চালাই
আবার সাগর বুকে পাড়ি জমাই, মরণকে ঠেলিয়া।
আসমানের তারায় মোদের ঘড়ির কাজ যোগায়,
বিনা কম্‌পাসে দিক ঠিক করি আকাশপানে চাইয়া।
আমরা আরাকানে রেঙ্গুনে জাপানে জার্মানে
ইউরোপে, আরবে, চীনে আছি চাঁডি গাঁইয়া।
আমরা পাইলট, ড্রাইভার, জেহাদে সাহসী সোল্‌জার,
খুন দিতে খুন নিতে তৈয়ার, পিছু না হটিয়া।
আমরা নৌকায় করি ঘর, ঘুরি বন্দরে বন্দর।
বদর বদর বদর বদর জয়ধ্বনি দিয়া।
চাঁডিগাঁর হিন্দু মুসলমান, দুই শরীরে এক জান,
স্বাধীন সুখী এই পাকিস্তান, লইব গড়িয়া।

সোমদত্তী, ১৩ | ৫ | ৬০

৯১

ধর্ম কিসের বাড়াবাড়ি। (মোর ভাইকে কইও)
এই ধর্ম সেই ধর্ম বড়, বৃথা কেন দ্বন্দ্ব কর,
এক ধর্ম রয়েছে জগত ধরি,
রাজা প্রজা সবের ভিতরে, একভাবে নড়ে চড়ে
তারে চিনতে সাধুতা ফকিরী॥
দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদ সাকার কি শূন্যবাদ
নিজ সংস্কার সত্য মনে করি।
অন্যের সংস্কার ভুল বুঝতে নারে সত্যের মূল
অভিমানে তর্ক করে মরি॥
ওয়াটার, জল, ইয়া, পানি বিভিন্ন নামেতে জানি
সকলে পিপাসা শান্তি করি।
(তেমনি) গড, খোদা, শিব, রাম সকলি একজনের নাম
সবাই মোরা সত্যের পূজারী॥

সংস্কারমুক্ত যার মন, সেই হয়েছে মহাজন
হাজার দণ্ডবৎ তারে করি।
মানুষ মাত্রে অভেদ জ্ঞান, শত্রু মিত্র এক সমান
দুই কুলে তার বাহাদুরি ॥
মানবের আদি পিতা শুনি এক আদমের কথা
দ্বিতীয় আদম আর না হেরি।
আদমি সবাই ভাই ভাই তাতে কিছু দ্বিধা নাই
বুঝের গলদ বুঝে উঠতে নারি ॥
অহিংসা পরম ধর্ম সকল ধর্মের সারমর্ম
যার ধর্ম তার পক্ষে বড়, দেশ উন্নতির চেষ্টা কর
হিংসা নিন্দা অভিমান ছাড়ি ॥
(মোর ভাইকে কইও)

১৪।৫।৬০

৯২

দেশর হাল চাল কিছু বুঝ নি
গরীব কারবাল্লা ময়দান ঠাওর পাইয়নি।
হাডত বাজার কইত্তাম যাই, জিনিষর দাম দেখি ও ভাই
মাথাত উডের বাই,
আঁই হারাদিনে দুই টেঁয়া পাই ছয়জনেরে কুলায় নি।
কি দি পোয়া পড়াইব গরীবর সাধ্য নাইরে কিতাব কিনিব
মূর্খের সংখ্যা বাড়ি যাইব, দেশর ভালা হইব নি।
মাইন্‌সে আটার রুটি খার, বৌয়র কাপড় হত্তর গিরা
টেঁয়া কডে পার, হাটতে বসতে গা দেখা যার
মন্দর ইজ্জত থাকের নি।
যদি কাপড় কিনতাম যাই, যোলো টেঁয়া শাড়ীর জোড়া
তারথুন আর কম নাই,
কাপড় যাইব মাসর কামাই ভাত ন খাই ভাই পারি নি।

দেশত সমবায় হইয়ে, গরীব গুন্যা বাচিবার লাই পথ করি দিয়ে
সমবায়ে যোগ ন দিলে গরীব আর বাচিবা নি।

গোমদণ্ডী, ২৪ | ৮ | ৬০

৯৩

আমার সাম্পান যাবে উজানে
কে যাবি রে আয় রে তোরা আমার হাউসের সাম্পানে।
বাদাম দিলে উড়ি চলে রে দাদা মদত করে পবনে।
নতুন বসে নতুন সাম্পান সোনালী বরণ
বাতাস পেলে চলে যেন বিজলীর মতন
পাল খাটালে বেগে চলে রে দাদা ভাটি উজান ন মানে।
সুরজবেত গাছের সাম্পান সুন্দর গাছের দাঁড়
ডবল মারকিন পালে আছে চিন্তা নাইত আর,
হাঁসের মত গলা তোলারে দাদা পাখা দুইখান পিছনে।
ছয়কুড়ি বছর গ্রান্টি বানাইলাম সাম্পান
কারিগরের কারিগরি বিনা পয়সার দান
তাতে জলই ছারা কুলুব মারা রে দাদা বাতাস খেলে মাঝখানে
এই সাম্পানে যোগায় আমার বাড়ীর খাজানা
এই সাম্পানে যোগায় আমার বৌয়ের গহনা
এই সাম্পানে ভাত কাপড় দে রে দাদা আমি দিন কাটি শান্ত মনে
কে যাবি রে আয় রে আমার হাউসের সাম্পানে।

গোমদণ্ডী, ১৫ | ৯ | ৬০

৯৪

দেখ্যনি ভাই চৌদ্দ কার্তিক কি কাণ্ড হইয়ে।
গজব গজব মুখে কইতাম এইবার চোখে দেখাইয়ে॥
শুনতাম কুতুবদিয়া কুতুব বর্তমান
পীর বুজর্গ নমানের ভাই কি দারুণ তুফান;
মা বুকে লই কত সন্তান এক হংগে মরি রইয়ে॥

মিলেটারী শোলজার, পোয়া মরা বুড়া মরা গারি কূল ন পার।
পোঁচা গন্ধে পেট ফুলি যার নাকত কাপড় লাগাইয়ে॥
চাটি গাঁ চাটির জায়গা ভাই
জিন পরী ভূত ধাই পলাইয়ে চাটির রোশনি পাই।
পানিয়ে এই দেশ ডুবাই, আউলিয়া কডে গেইয়ে॥
যদি খোদার বান্দা হও, কুতুবদিয়া বাঁশখালি নয়
গহিরা পতেঙ্গা যাও
চোখে দেখি বিশ্বাস যাইবা কি উল্ডাইয়ে॥
হুন হিন্দু মুছুয়ান ভাই, আল্লা আছে ঈশ্বর আছে
কেহর মনত নাই
হুশিয়ারে চলিবা ভাই সাবধান বাণী জানাইয়ে॥
ধর্ম কর্ম ছাড়ি মানুষ স্বার্থ দিগে মন
ইমানের গলদ ঘটিয়া এই দুখের কারণ
এই বিপদে আউলিয়াগণ, হেতার লাই ফিরি রইয়ে॥

১২।১১।৬০

৯৫

কবি সাহিত্যিক যারা সমাজের দিশারী তারা,
এ জগতে সাহিত্য অমর।
আমাদের লোকসাহিত্য মৃতপ্রায়, পুনঃপ্রাণ সঞ্চার আশায়,
কেহ দেয় না সেই দিকে নজর।
সাহিত্য জীবন সাথে সংযোগ রাখে দিনে রাতে
জীবনের সুখ দুঃখ প্রচার করে!
পুঁথি, কথা, গাথা, গানে, প্রবন্ধ, দর্শন, বিজ্ঞানে
সবাই সাহিত্য আখ্যা ধরে।
বড় দুঃখ জাগে মনে, আমার প্রথম জীবনে,
গ্রাম্য জীবন ছিল আনন্দে ভরপুর।
বরিষায় প্লাবন হলে, নৌকা খেলায় পান্টা চলে
প্রাণ মাতান পাইয়ল গানের সুর।

মাঠের দিকে দিলে কান, কত মধুর চাষীর গান,
রাত্রে শুনতাম মনসার ভাসান।
জারী সারি, বাউল গাজী, ঐ গান শুনি না আজি
নিরানন্দে সবার মুখ ম্লান।
নিরানন্দ সবার গলা, পল্লীর যত মেয়েগুলা
আনন্দেতে দিত উলুধ্বনি।
পটি কীর্তন রামায়ণ, গ্রামে হত সর্বক্ষণ,
ফুলপাতগান এখন আর না শুনি।
ছেলে মেয়ের বিয়ার কালে, পাড়ার মেয়ে সকলে
আনন্দে গাহিত বিয়ার গান।
পুরুষেরা থাকত দূরে, হাওলার গান বলে যারে,
সুরে মুগ্ধ হইত সবার প্রাণ।
যখন মহরমের চাঁদ উঠে, জারী-গানের জোয়ার উঠে
মুসলিম ভাইদের কারবালার কাহিনী।
ইমাম শহীদের কথা, এজিদের নিষ্ঠুরতা
শুনিলে চোখেতে আসত পানি।
ফাগুন কি চৈত্র মাসে বসন্ত উৎসব বসে
হোলিগানের জমিত আসর।
যে দিকে ফিরাই আঁখি, শূন্যময় সকলি দেখি,
রসশূন্য নগর বন্দর।
চৈত্রমাস বছরের শেষ, সৃষ্টি হত এক পরিবেশ
বাড়ী বাড়ী শিবের গাজন।
পল্লীর সংস্কৃতি যত, প্রায় সব তিরোহিত,
শুনা যায় না ঢাকের বাজন।
সিনেমা সহরে চলে, ছিটে ফোটা গ্রামাঞ্চলে,
থিয়েটার দুই একটা মাত্র হেরি।
লোকের সংস্কৃতিগুলি আবার ধরিলে তুলি
পূর্ব সম্পদ আসত মোদের ফিরি।

নাইক যাত্রা পালাগান, সকলি আজ অন্তর্ধান,
পল্লী হতে নিশ্চিহ্ন হয়েছে।
যত পল্লী কবিগণে, যুঝিয়ে দুর্ভিক্ষ সনে,
কবিগানটি বাঁচায়ে রেখেছে।
গাজী সুর, মাঝির সুর, কৃষকের বলিষ্ঠ সুর
কবি কণ্ঠে মুখরিত হয়।
দেশের লোকের আদর নাই, রেডিওতে শুনতে পাই,
মলকা বানুর হাওলার গানও কয়।
সহর আর গ্রামে, সংস্কৃতির মাধ্যমে,
যোগাযোগ হইত স্থাপন।
আশা জাগে মনে মনে, উভয়ের শুভ মিলনে
দেশের হত কল্যাণ সাধন।

ঢাকা, ১৯৬১

৯৬

তুমি কোন বা দেশের মাঝি রে উজান গাং যাও বাইয়া॥
ফিরবার পথে থাকব বসে খবর যাইও কইয়া॥
এই নদীতে উঠে নিত্য তরংগ অপার,
ধার চিনিয়ে পার হয়ে যায় সুজন কর্ণধার
তারা আগের জোয়ারে নৌকা ছাড়ি,
সুখে যোগায় খেওয়ার পাড়ি
ঠিকে বসে ছুপান ধরি বাদাম খান উড়াইয়া॥
বন্দিনী করিল মোরে পরবাসে আনি,
অত নিষ্ঠুর মাতা পিতা কেমনে না জানি।
উজান বাটি নৌকা বাও
যদি একটু দেখা পাও,
মা বাপরে কইওরে সংবাদ নাইয়র নিত আইয়া॥
একেতে জোছনা রাতি দক্ষিণা পবন,
বসন্ত বাতাসে প্রাণে জাগায় শিহরণ,

কোকিল ডাকে বকুল ডাকে
ভ্রমর উড়ে ফুলে ফুলে,
সারি গাও ঢেউয়ের তালে করতালি দিয়া ॥

৮ | ১১ | ৬২

৯৭

প্রকৃতির একি খেলা বার বার,
ধ্বংসলীলা আরম্ভিল চট্টগ্রামের বুকে
ষাট সাল হতে দেশ ধনে প্রাণে হল শেষ
বলিতে ভাষা আসে না মুখে।
গত মে মাসের আটাশে, যে দুর্দশা হল দেশে
ঘরে ঘরে ছুটল কান্নাকাটি।
দুরন্ত সাইক্লোনে ধ্বংস করল ধন প্রাণে
প্রথমে লোকের নিল ঘরবাটী।
সঙ্গে সঙ্গে সাগরের জল, গরু ছাগল হল তল,
ঠিক নাই কে কোথায় গিয়াছে।
পথ দেখেনা ঘোর আঁধারে, বাঁচাও বাঁচাও চীৎকার ছাড়ে
মুষল ধারে বৃষ্টি পড়িতেছে।
পুত্রহারা হয়ে মা'য়, পাগলিনী মত ধায়,
হা পুত্র হা পুত্র বলে মুখে
পতিহারা হয়ে সতী, ছুটে যায় দ্রুতগতি
ঘন ঘন করাঘাত হানি বুকে।
বলিতে না পাই ভাষা, চট্টলবাসীর যে দুর্দশা
নদী জুড়ি মৃতদেহ ভাসে।
আবাল বৃদ্ধ বনিতায় জলোচ্ছ্বাসে প্রাণ হারায়
মরা মানুষ রাস্তার দুই পাশে।
সাগরের জল আসি, ঘর বাড়ী গেল ভাসি
ভূমিসাৎ মাটির ঘর যত।

আউস আমন চারা হয়েছে চট্টগ্রাম ছাড়া
ফসল জমি খেলার মাঠের মত।
থাল বাটি যার যাহা আছে ঘর পড়ে সব মাটির নীচে
বিছানার নাই বালিশ কাঁথা।
রাত্রে যখন শুয়ে পড়ি, মশার কামড়ে নাই মশারি
ছাতার বদল মাথায় কলাপাতা।
তার পরদিন আটটার পর থামিল দুরন্ত ঝড়
কে কোথায় চিহ্ন নাহি পায়।
মাঝে মাঝে দুই একজন সংজ্ঞা নাই আছে জীবন
দেখতে ঠিক মরার প্রায়।
মীরসরাই সীতাকুণ্ড ডুলাহাজারার অদ্ভুত কাণ্ড
নরমুণ্ড গড়াগড়ি যায়।
মরে গিয়াও যারা আছে তারাও মরতে বসেছে
সর্বনাশা উদরের জ্বালায়।
যারা কুলের কুলবালা বৌঝিয়ারী লজ্জাশীলা
শিশু রোগী সাঁতার নাহি জানে।
নিষ্কলুষ নিষ্পাপ যারা আগে মরিল তারা
কোন্ বিধির বিধানে।
কোথায় চাষীর মই কোদাল, কোথায় লাঙ্গল জোয়াল
ঝড় দানব সব নিয়া গেছে।
মাথায় হাত দিয়েছে চাষীরা চাষ হবে কি বলদ ছাড়া
ভাবে শুধু বুঝাবে কার কাছে।
কেটেল লোন পঞ্চাশ টাকা বলদ জোড়া তিন শ টাকা
কিসে চাষ হইবে এবার।
রিলিফ খাদ্য যাহা পায় এক বেলা না কুলায়
রিলিফ পাইলে রেশন পাইতে নারে।
হিন্দু মুসলিম চাষী মিলে, জীবন বাঁচাতে হলে,
সকলে আওয়াজ তোল জোরে।

বাকী খাজনা কৃষি ঋণ চাষার ভেবে দুর্দিন
মাফ করে দেউক আমাদের সরকারে।
দারুণ বন্যার কবলে, চাষীবংশ রসাতলে
হালবলদ চাষের কিছু নাই।
হতাশা চাষীদের মনে চাষ হবে কেমনে
রাত্র দিন চক্ষে নিদ্রা নাই।
পরিবারে সাতজন মিলে সপ্তাহে রিলিফ পাইলে
আধপেটা খায় তিনদিন করি গত।
রিলিফ পাইলে রেশন নাই, তারপর বল কোথায় যাই
আটকা পড়ি ফাটকা কলের মত।
আমরা যারা রিলিফ পাইলাম লোনেও বঞ্চিত হলাম
ভিটার উপর ঘর উঠাব কিসে।
বড় লোক বড় হয়, গরীবের সর্বস্ব ক্ষয়
জর্জরিত অভাবের বিষে।

৯৮

হিন্দু মুসলিম দেশবাসী শুন বন্ধুগণ,
বারে বারে দেশে কেন ঘটে অঘটন ॥
জাতির পিতার বাণী ২ নিলে মানি হিন্দু মুসলমানে।
ভ্রাতৃত্ব মিলনে আছি স্বাধীন পাকিস্তানে ॥
তবে কেন বিশৃঙ্খল ২ ভাইসকল দেখ বিচারিয়া।
সমস্যা সমাধান হয়কি লাঠি ছুরি দিয়া।
জাতিসংঘের সনদ আছে ২ সবাইর কাছে বলি বন্ধুগণ
এত হানাহানি দেখি কেন অকারণ ॥
হিন্দুগরিষ্ঠ অঞ্চল ২ ভাইসকল হিন্দুস্থান হবে।
মুসলিমগরিষ্ঠ অঞ্চল পাকিস্তানে যাবে ॥
রাষ্ট্রসংঘের রায় মতে ২ বিচারেতে হয়ে যাবে ধার্য।
ভাইয়ে ধরে ভাই সংহারে কি জঘন্য কার্য ॥

স্বাধীন হলাম ষোল বছর তার খবর জানি বন্ধুগণ।
তবু কেন নিরীহের উপর এত নির্যাতন ॥
দেখুন হিন্দুস্থানে ২ মুসলিমগণে আছে হতাশায়।
নিশ্চয়তা নাই কিছু কবে কি ঘটায় ॥
তেমনি পাকিস্তানে ২ হিন্দুগণে দুশ্চিন্তায় মনভরা।
কখনি কি দশা ঘটে নাই কূল কিনারা ॥
বন্যা আর ঘূর্ণিঝড়ে অনেক ঘরে ছাউনি আজও নাই।
দুইবেলা পেট ভরে খায় না ভেবে কিবা চাই ॥
পশ্চিম বাংলায় মুসলিমগণ ২ অনশন অনেক জনে করে।
হত্যা লুট গৃহদাহ গরীবের উপরে ॥
গরীব হিন্দু মুসলিম মোরা ২ আধা মরা উদর পোষণে।
তাদের উপর অত্যাচার কোন্ বিধির বিধানে ॥
আইন কানুন কোর্ট কাছারি ২ নিত্য হেরি উভয় দেশে আছে।
দোষী লোক শাস্তি পাবে আইনেতে রয়েছে।
নিরপরাধ সাজা পেতে ২ জীবনেতে দেখি নাই কখন।
যার দেশে তার বিচার হবে আছে নির্ধারণ।
দেশের সম্পদ নষ্ট করি ২ বুঝতে নারি কিবা শান্তি পায়।
রামের দোষে শ্যামের দণ্ড দেখেছেন কোথায় ॥
এই সব দেশনাশা কার্য অন্যায্য বন্ধ নাহি হলে।
শান্তিকামী লোকের সুখ নাই কোন কালে ॥
দুর্ঘটনা ঘটায় যারা ২ মূলে তারা গুণ্ডা দলের লোক।
টাকা পয়সা সোনা রূপার উপর আছে তাদের ঝোঁক।
সাত পুরুষের ভিটা ছাড়ি ২ দেশান্তরী হিন্দু মুসলিম হয়।
সেই দৃশ্য দেখিলে ভাই প্রাণে সহ্য নয় ॥
দারুণ শীতে কাপড় নাই ২ দেখ ভাই শিশু কোলে নিয়া।
প্রাণের আশায় যায় দেশের মমতা ছাড়িয়া ॥
জননী জন্মভূমি ২ নিত্য নমি জাহ্নবী জনক।
জনার্দন পঙ্ক জ কার শান্তির বাহক।
দেশের দশা দেখে ২ দুই চোখে আসে ভাই জল।

কে আনিল এই উৎপাত অমৃত গরল ॥
স্বাধীন নাগরিক হই কারে কই বাক্য নাহি সরে।
ভাই বলে আলিঙ্গিয়া জড়ায়ে ধরি কারে ॥
এই সম্পর্ক চিরদিন অমলিন যাবৎ জীবন।
জন্ম হতে ধর্ম বড় বলে জ্ঞানীগণ ॥
শান্তিকামী মানুষ যারা সদা তারা পরহিতে রত।
পর-জীবন রক্ষায় নিজ প্রাণ দিতে উদ্যত ॥
আমীর হোসেন কিসমত আলী গেলা চলি নিজ জীবন দিয়া।
পূর্ব পাকিস্তানে এক ইতিহাস রচিয়া ॥
আরও অনেক জনে জীবন দানে পর-প্রাণ রক্ষিতে।
প্রমাণ পেয়েছি দেশে এইবার দুর্যোগেতে।
মানুষকে যে ভালবাসে কয় হাদিসে হজরতের (দঃ) বাণী।
খোদায় তাকে ভালবাসে হাদিসেতে শুনি ॥
গীতায় জীবে শিবে এক বলে কয়।
জীবে সেবা মহাপুণ্য করেছে নির্ণয় ॥
পবিত্র খোদার কালাম আছে সুনাম জগত মাঝার।
সেই কথা কে রাখিল কে মানিল আর ॥
অহিংসা পরম ধর্ম তার মর্ম যদি মানিত।
তবে কি মানুষকে মানুষ আঘাত করিত ॥
কি হিন্দু মুসলমান ২ নাই ব্যবধান কায়েদে আজমের বাণী।
হিন্দু মুসলিম নাইরে ভাই সবাই পাকিস্তানী ॥
চট্টগ্রামে এক ঘরে ২ বাস করে হিন্দু মুসলমানে।
এক পুকুরে স্নান করে আনন্দিত মনে ॥
সুরেন্দ্র ব্যানার্জি বিপিন পালে গেল ব'লে শুনিয়াছি কানে।
এমন মিলন বাংলাদেশে নাই কোনখানে ॥
সেই ঐতিহ্য কোথায় গেল ২ বল বল বন্ধুগণ।
কোথায় গেল হিন্দু মুসলিম অপূর্ব মিলন ॥
বার আউলিয়ার চট্টগ্রাম ২ এই সুনাম কেমনে রাখিবে।
আলাউল নবীন সেনে স্থান কোথায় দিবে ॥

দেশপ্রিয় সবার প্রিয় মাষ্টার কাজিমালি।
সূর্য সেন প্রীতিলতার সুনাম যাবে চলি॥
ভাইয়ে ভাইয়ে ২ এক হয়ে ছিলাম সব সময়।
আজ কেন তোমায় দেখে আমার মনে ভয়॥
তোমার আশ্বাসে আমার বুকে আসে বল।
আমি যথা বৃক্ষ হই তুমি তথায় জল॥
কেহ ছাড়া কেহ নাই দেখ ভাই দেখ বিচারিয়া।
বাগানের সৌন্দর্য বাড়ে নানা ফুল দিয়া॥
পাকিস্তানে হিন্দুগণে ভাবে মনে হিন্দুস্থানে যাব।
জানমালের নিরাপত্তায় সুখে দিন কাটাব॥
নিশ্চিত সুখ ছাড়ি দেশান্তরী হয়ে পাবে তাপ।
অনিশ্চিত সুখের জন্য কোথায় দিবে ঝাঁপ॥
ছত্রিশ জাতে এক দেশেতে মাখামাখি রই।
অন্য দেশে চলে গেলে সেই পরিবেশ কই॥
সেই দেশের মানুষজনে আমার মনে মিলন যদি হয়।
বিশ বছর সময় লাগিবে তার আগে নয়॥
জীবনের সন্ধ্যায় এসে আপনাদের পাশে আর কি বলতে পারি।
শান্তির পতাকা তুলুন হাতে হাতে ধরি।
বিরহে প্রেম বলিষ্ঠ সাধুগণ বলে।
ভ্রাতৃপ্রেম অক্ষুন্ন রবে আবার মিলন হলে॥

৯৯

ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি আর কয়দিন চলিবে বল
সাম্রাজ্যবাদীর ফাঁদেতে পা দিয়ে সর্বনাশ হল
আর কয়দিন চলবে বল॥
ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, সূর্য সেন, টেগরা বল।
দুই ভাইয়ে আন্দোলন করে, বৃটিশকে খেদাল জোরে,
স্বাধীনতা কাহার তরে, মানুষ যদি না রহিল।
বার বার দাংগা দাপটে, গরীব মরে হাটে মাঠে।

যার বুদ্ধিতে দাংগা ঘটে তার গায়ে কি আঁচড় পৈল ॥
দাংগার বীজ ছিল কোন্ দেশে, তারে উড়াই আনে কোন্ বাতাসে।
হিন্দু মুসলিম বিনাদোষে, কি কারণে প্রাণ হারাল
লো মাফেজ হতে শুনি, মানুষ পাঠায় কাদের গণি
মানুষের মানুষের প্রাণহানি, এ মানুষ কে পাঠাইল ॥
আরও একটা আবেদন ২ বন্ধুগণ করি সবাইর কাছে।
দুর্বৃত্ত গুণ্ডা দেশে বহু গজায়েছে ॥
হত্যা লুট রাহাজানি ২ দিন যামিনী যেই সেইখানে হয়।
স্বাধীন দেশে এই সব দুষ্টে দেবেন না প্রশ্রয় ॥
বিষবৃক্ষ অল্পকালে ২ ধ্বংস হলে দেশের লোক সন্তুষ্ট।
গোড়া মোটা হলে তারে নোয়াইতে কষ্ট।
ম্যালেরিয়া কালাজ্বরে ২ নাহি করে জাতের বিচার।
যারে পারে তারে ধরে প্রকৃতি তাহার ॥
আজকে আমাকে যারা করে অত্যাচার।
কাল তোমারেও না করিবে কি গ্রাপ্তি তার ॥
তাই বলি বন্ধুগণ ২ সচেতন হও জানি শুনি।
চোরের নাই শ্বশুরবাড়ী প্রাচীন লোকের বাণী ॥

গোমদণ্ডী, চট্টগ্রাম, ১৬ | ২ | ৬৪

১০০

দেশবাসী বন্ধুগণ, আমার এই নিবেদন.
পাক জায়গা পবিত্র স্থান জানি
হিন্দু আর মুসলিমে রয়েছি ভ্রাতৃত্ব প্রেমে,
তবে কেন এত হানাহানি।
তার মূলে কিবা আছে, বলতে চাই আপনাদের কাছে।
মনে করুন অতীতের ঘটনা।
বৃটিশ এই নীতি ধরে দুই শত বৎসর শোষণ করে
পূব পশ্চিম পাঞ্জাবে নিশানা।

সাদা চামড়া চলে গেছে, এখনও তার দালাল আছে।
বুঝিতে বাকি নাই কিছু আর।
সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টি দিলে জমা খরচ যাবে মিলে,
দাংগার তলে গোপন হস্ত কার।
যত কায়েমী স্বার্থের দল হয়ে উঠেছে প্রবল,
নিজস্বার্থ হাসিল করিবারে।
চোরকে বলে চুরি করিস গৃহীকে বলে সজাগ থাকিস
বিভেদমন্ত্র কানে কানে ছাড়ে।
গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার হয় যখন,
তখন তারা দাংগা উস্কায়।
বিভেদের নীতি নিয়া ধর্মীয় অন্ধতা দিয়া
স্থানে স্থানে অঘটন ঘটায়।
বহু যুগ যুগান্তর হতে দেশের এই ভিটামাটিতে
হিন্দু মুসলিম দোঁহে করি বাস।
এক মায়ের সন্তানের মত পুরুষানুক্রমে যত
এক মাঠে দোঁহে করি চাষ।
গুজব ছড়ায় যারা জনতার দুশমন তারা
রুখতে হবে ঐ সকল দুশমনে।
দেশের হিন্দু মুসলমান সুখী সুন্দর পাকিস্তান
গঠন করুন মিলে সর্বজনে॥

১০১

অত্যাচারের প্রতিশোধ আমার নেওয়া নাইবা হবে,
আমার পরে আসবে যারা বোধকরি তারাই নেবে।
সারাজীবন ধরে আমি তারই চেষ্টা করে যাব।
মনের কোণে সুর উঠিবে, কলম দিয়ে তাল বাজাব।
লাল মেঘেতে করবে খেলা আকাশ ভরা জোছনা রাতে।
দোল খেয়ে জ্বলবে বাতি প্রতি ঘরে লাল শিখাতে।

তার আলোতে স্বপ্ন সফল করবে মুক্তি পূজারীরা
সেদিন হবে জানাজানি দোস্ত কারা দুশমন কারা।
সোনার লোভে বিভোর হয়ে যার তার বুকে মারছ লাথি
সময় বুঝে মাথা গুঁজে পালাবে তোমার পাপের সাথী
হিংস্র জন্তুর ডাক থামিবে, পথের বাধা হবে শেষ।
বুক ফুলিয়ে বলে উঠব, এই ত আমার দেশ॥

পরিশিষ্ট—১

রমেশ শীলের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

(কোন লোককবির জীবনের নির্ভুল সন তারিখ পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং অভ্রান্ততার কোন দাবীই এখানে করা হচ্ছে না।)

জন্ম, চট্টগ্রামের বোয়ালখালী থানার গোমদণ্ডী গ্রামে, ১৮৭৭ (১২৮৪, ২৬শে বৈশাখ)

সাত বছর (এগার ?) বয়সে পিতার মৃত্যু, ১২৯১ (?)

এগার বছর বার্মায় প্রবাস

কবিয়াল হিসাবে আত্মপ্রকাশ, ১৩০২ (?)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ১৯১৪-১৮

খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলন, ১৯২০ ২২

আসাম-বেঙ্গল রেল ধর্মঘট, ১৯২১

মাইজভাণ্ডারের পীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ, ১৯২৩ (?)

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, ১৯৩০, ১৮ই এপ্রিল

'রমেশ-উদ্বোধন-কবি-সংঘ'র প্রতিষ্ঠা, ১৯৩৮(?)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৩৯-৪৫

বঙ্কিম সেনের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে এলেন রমেশ শীল, পার্টির সদস্য হলেন, ১৯৪৩

বাগোয়ানে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম জেলা কৃষক সম্মেলনে চট্টগ্রাম জেলা কবি সমিতি গঠন, ১৯৪৩

ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে কবিগান, মহম্মদ আলী পার্ক (কলিকাতা), ১৯৪৫

দাঙ্গার পটভূমিতে কলকাতায় পাড়ায় পাড়ায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গান, ১৯৪৬

দেশ বিভাগ, পাকিস্তানের জন্ম, ১৯৪৭, ১৪ই অগাস্ট

কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে কবিগান, শ্রেষ্ঠ কবিয়াল হিসাবে পদক লাভ, ১৯৪৮

ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ববঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে লোকসাহিত্য শাখার সভাপতি পদগ্রহণ ও অভিভাষণ প্রদান, ১৯৫৪

রাজদ্রোহিতার অভিযোগে এক বছরের জন্য বিনা বিচারে বন্দী, ১৯৫৪
কাগমারী সম্মেলনে রমেশ শীলকে পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবিয়ালের সম্মান দান, ১৯৫৬

ঢাকার বিখ্যাত 'বাফা' সাংস্কৃতিক সংসদ কবিকে পূর্ব পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ লোক-কবির সম্মান দেয়, ১৯৬২। '…সাধারণ জনের প্রতিনিধি হিসাবে (আপনি) গানের মাধ্যমেই ক্ষুধার অবসান, তৃষ্ণার শান্তি, হিংসার অবলুপ্তি ও সৌন্দর্যলোক সৃষ্টির জন্য সংগ্রাম করেছেন। আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে আপনার নাম উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।'—বুলবুল ললিতকলা একাডেমি প্রদত্ত মানপত্র।
চট্টগ্রামে ও ঢাকায় রমেশ শীলকে শ্রেষ্ঠ লোককবি হিসাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়, ১৯৬৪
জীবনাবসান, গোমদণ্ডী গ্রামে, নিজের বাড়িতে, ৬ই এপ্রিল, ১৯৬৭। তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুসারে তাঁকে কবর দেওয়া হয়। শোকসভায় 'প্রায় দশ সহস্রাধিক হিন্দু মুসলমান উপস্থিত ছিলেন।'

পরিশিষ্ট—২

রমেশ শীলের গানের বই—অসম্পূর্ণ পরিচিতি

লোকগীতি: রমেশ শীলের শ্রেষ্ঠ গান ও ছড়া—প্রকাশক: মহম্মদ ইউনুস, সম্পাদক, রমেশ শীল সম্বর্ধনা সংসদ, চট্টগ্রাম।

ভাণ্ডারে মাওলা; আশেক মালা—(১ম ভাগ); শান্তি ভাণ্ডার—(২য় ভাগ); আত্ম তত্ত্ব—(৩য় ভাগ); নূরে দুনিয়া; সত্য দর্পণ; জীবন সাথী; মুক্তি দরবার; দেশের গান; ভোট রহস্য; পাকিস্তান সঙ্গীত; দেশ দরদী; বিচ্ছেদ তরঙ্গ; চট্টল পরিচয়; শীল সমিতির কবিতা; চাষীর গান; মানব বন্ধু; লোক কল্যাণ; বিধবা বিবাহ বা সমাজ রহস্য। চাটগাঁয়ের পল্লীগীতি (১ম ভাগ) চাটগাঁয়ের পল্লীগীতি (২য় ভাগ)।

(প্রথম সংকলনটি ছাড়া অন্যান্য সমস্ত সংকলনের
প্রকাশক: শ্রীযজ্ঞেশ্বর শীল, পোঃ গোমদণ্ডী, চট্টগ্রাম।
মূল্য: চার আনা, আট আনা, বারো আনা)